স্বামী বিবেকানন্দ

রায় চৌধুরী এণ্ড কোং
কলিকাতা২৬

প্রকাশক—
শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র রায় চৌধুরী।
স্বত্বাধিকারী—
রায় চৌধুরী এণ্ড কোং ; ১১৯, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড,
কলিকাতা—২৫

মুদ্রাকর—
শ্রীসুকুমার চৌধুরী : বাণীশ্রী প্রেস।
৮৩-বি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা—৬

প্রথম সংস্করণ।
বৈশাখ, ১৩৫৬

দ্বিতীয় সংস্করণ।
জন্মাষ্টমী, ১৩৫৭

মূল্য
দুই টাকা।

সুলভ সংস্করণ
এক টাকা চার আনা

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৯৫২ সালের প্রবেশিকা পরীক্ষার উপপাঠ্য পুস্তকরূপে অনুমোদিত) *(Notification No. T. 824)*

বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা সংসদের ১৩৫৮ সালের মধ্য পরীক্ষার পাঠ্য তালিকা ভুক্ত।

শিক্ষা

দ্বিতীয় সংস্করণ।

We want that education
by which character is formed,
strength of mind is increased,
the intellect is expanded and
by which one can stand on
one's own feet."

Swami Vivekananda.

"To solve any problem of Indian education, it is essential that there should first be experience of the humbler routine of teaching; and for this the supreme and essential qualification is to have looked at the world, even if only for a moment, through the eyes of the taught. Every cannon of educational science proclaims this fact. To teach *against* the aspirations of the taught, is assuredly to court ill results instead of good"

SWAMI VIVEKANANDA
(in the words of Sister Nivedita)

কয়েকটা পাস দিলে বা ভাল বক্তৃতা কর্‌তে পারলেই তোমাদের কাছে শিক্ষিত হ'লো। যে বিদ্যার উন্মেসে ইতর সাধারণকে জীবন সংগ্রামে সমর্থ করতে পারা যায় না, যাতে মানুষের চরিত্র-বল সিংহসাহসিকতা এনে দেয় না, সে কি আবার শিক্ষা? যে শিক্ষায় জীবনে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারা যায়, সেই হচ্ছে "শিক্ষা"।

যে জ্ঞান হৃদয় ও মনকে বিশুদ্ধ করে একমাত্র তাহাই সত্য জ্ঞান। আর সব কিছুই জ্ঞানের পরিপন্থী।

শ্রীরামকৃষ্ণ

মানবের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার বিকাশ সাধনই শিক্ষা।

স্বামী বিবেকানন্দ

سیوا گرام
براہ واردھا (سی-پی)

सेवाग्राम
वर्धा होकर (मध्य प्रांत)

SEVAGRAM
Via WARDHA (C. P.)

Surely Swami Viveka-nanda's writings need no introduction from anybody. They make their own irresistible appeal.

22-7-'41

Bapu

স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলীর জন্য নিশ্চয়ই কোন পরিচায়িকার প্রয়োজন নাই। সেগুলির নিজস্ব মর্ম্মস্পর্শিতাই অনিবার্য্য।

২২-৭-৪১

মহাত্মা গান্ধী

বিশ্বকবি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে

শিক্ষা

শ্রদ্ধার অঞ্জলি-স্বরূপ নিবেদিত হইল।

প্রশস্তি

বিবেকানন্দ বলেছিলেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি। বলেছিলেন, দরিদ্রের মধ্যে দিয়ে নারায়ণ আমাদের সেবা পেতে চান। এ'কে বলি বাণী। এই বাণী স্বার্থবোধের সীমার বাহিরে মানুষের আত্মবোধকে অসীম মুক্তির পথ দেখালে। এ-ত কোন বিশেষ আচারের উপদেশ নয়, ব্যবহারিক সঙ্কীর্ণ অনুশাসন নয়। ছুঁৎমার্গের বিরুদ্ধতা আপনই এর মধ্যে এসে পড়েছে। তার দ্বারা রাষ্ট্রিক স্বাতন্ত্র্যের সুযোগ হ'তে পারে ব'লে নয়, তার দ্বারা মানুষের অপমান দূর হবে ব'লে, সেই অপমানে আমাদের প্রত্যেকের আত্মাবমাননা।

বিবেকানন্দের এই বাণী সম্পূর্ণ মানুষের উদ্বোধন ব'লেই কর্মের মধ্যে দিয়ে, ত্যাগের মধ্যে দিয়ে মুক্তির বিচিত্র পথে আমাদের যুবকদের প্রবৃত্ত করেছে।

ফাল্গুন ১৩৩৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিবেকানন্দের মত বীর্য্যবান্ পুরুষসিংহ আর হয় নি। আমরা অনুভব করি, তাঁহার প্রভাব এখনও বিরাটভাবে কার্য্যকরী। আমরা জানি না, কিরূপে বা কোথায় ভারতাত্মায় সিংহবিক্রম প্রবেশ করেছে। তথাপি আমরা বলি, 'দেখ! মাতৃভূমির জাগ্রত আত্মায় বিবেকানন্দ এখনও জীবন্ত। ভারত-মাতার সন্তানগণের হৃদয়ে বিবেকানন্দ অদ্যাপি অধিষ্ঠিত।' ....যে মহৎকার্য্য দক্ষিণেশ্বরে আরব্ধ হয়েছে তাহা সমাপ্ত হওয়া ত দূরের কথা তাহা এখনও দেশ ভালরূপে বোঝেনি। বিবেকানন্দ যা পেয়েছিলেন এবং রূপায়িত করতে চেষ্টা করেছিলেন তা এখনও সম্পূর্ণ ভাবে কার্য্যে পরিণত হয় নি। যখন শ্রীবুদ্ধ তাঁর অনুভূত দর্শন ও নীতি আর্য্যজাতিগণকে শিক্ষা দিচ্ছিলেন তখন ক্ষুদ্রাকারে দ্রুতবেগে যা ঘটেছিল তারই পুনরাবর্ত্তন হচ্ছে এই যুগে ব্যাপক ভাবে ধীরে ধীরে।

শ্রীঅরবিন্দ

(১) শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের নিকট আমি যে কত ঋণী, তাহা ভাষায় কি করিয়া প্রকাশ করিব? তাঁহাদের পুণ্য প্রভাবে আমার জীবনের প্রথম উন্মেষ। নিবেদিতার মত আমিও মনে করি যে, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ একটা অখণ্ড ব্যক্তিত্বের (স্বরূপের) দুই রূপ। আজ যদি স্বামীজী জীবিত থাকিতেন, তিনি নিশ্চয়ই আমার গুরু হইতেন অর্থাৎ তাঁহাকে নিশ্চয়ই আমি গুরুপদে বরণ করিতাম। যাহা হউক যত দিন জীবিত থাকিব, ততদিন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের একান্ত অনুগত ও অনুরক্ত থাকিব—একথা বলা বাহুল্য।

(২) একদিন কটকে আমাদের এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তাঁর ঘরে ব'সে বই পড়ছি, হঠাৎ নজর পড়ল স্বামী বিবেকানন্দের বইগুলির উপর। কয়েক পাতা উল্‌টেই বুঝতে পারলুম এই জিনিসই আমি এতদিন ধ'রে চাইছিলুম। বইগুলি বাড়ী নিয়ে এসে গোগ্রাসে গিলতে লাগলুম। পড়তে পড়তে আমার হৃদয়মন আচ্ছন্ন হ'য়ে যেতে লাগল। এতদিন পর্যন্ত এমন আদর্শের সন্ধান কেউ আমাকে দিতে পারেন নি যা আমার সমগ্র সত্তাকে প্রভাবান্বিত করতে পারে। এই আদর্শের সন্ধান দিলেন বিবেকানন্দ। দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল, আমি তাঁর বই নিয়ে তন্ময় হয়ে রইলুম। আমাকে সবচেয়ে বেশী উদ্বুদ্ধ করেছিল তাঁর চিঠিপত্র ও বক্তৃতা। তাঁর লেখা থেকেই তাঁর আদর্শের মূল সুরটি আমি বুঝতে পেরেছি। মানবজাতির সেবা ও আত্মার মুক্তি—এই ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ। মানবজাতির সেবা বলতে বিবেকানন্দ স্বদেশেরও সেবা বুঝেছিলেন।

৬।৩।৩৬

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

নিবেদন

মান্দ্রাজ সরকারের ভূতপূর্ব শিক্ষামন্ত্রী শ্রী টী, এস, অবিনাশী-লিঙ্গম্ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় ত্রিচিনাপল্লী জেলে অবস্থানকালে স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী হইতে শিক্ষাসম্বন্ধে উক্তিগুলি সংগ্রহপূর্বক বিষয়ানুসারে ছয়টী অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেন। স্বাধীন ভারতের প্রথম ভারতীয় গবর্ণর-জেনারেল শ্রী সি, রাজাগোপালাচারিয়ার মহাশয় তখন সংগ্রাহককে এই বিষয়ে অনেক মূল্যবান্ পরামর্শ দেন। ঐ পাণ্ডুলিপিখানি 'এডুকেশন' নামে পুস্তকাকারে মান্দ্রাজ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণমঠ হইতে প্রকাশিত হয়। বর্তমান পুস্তকখানি উক্ত ইংরাজি পুস্তকের স্বচ্ছন্দ বঙ্গানুবাদমাত্র।

এই পুস্তকের অনুবাদ প্রকাশের জন্য মান্দ্রাজ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণমঠের বর্তমান অধ্যক্ষ মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক লিখিত অনুমতি দিয়াছেন। স্বামী জগদীশ্বরানন্দ সমগ্র পুস্তকের একটি প্রুফ সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।

কবিশেখর শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় মহাশয় নিবন্ধগুলির ভাষা কিছুকিছু পরিমার্জিত করিয়া দিয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন, এবং স্বামীজীর উদ্দেশে একটি কবিতা লিখিয়া দিয়াছেন সেজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিই। আমরা ভরসা করি, জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের যুগে স্বামীজীর বাণী নিশ্চয়ই বাংলার শিক্ষকমণ্ডলী ও ছাত্রছাত্রীগণকে দেশীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিবে। ইতি

বৈশাখ, ১৩৫৬

প্রকাশক

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

সুখের বিষয় "শিক্ষা"র প্রথম সংস্করণ অতি অল্প দিনের মধ্যে নিঃশেষিত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রচনা শৈলীর আদর্শ-স্বরূপ ইহাকে উপপাঠ্য পুস্তকরূপে অনুমোদিত করিয়াছেন। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থ নির্বাচন-সমিতিকে আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ইতি

জন্মাষ্টমী, ১৩৫৭ প্রকাশক

সূচীপত্র

স্বামী বিবেকানন্দের উদ্দেশে

এক পারে অনাচার, ব্যভিচার, ক্লীবতা, মূঢ়তা,
ধর্ম্মের দোহাই দিয়া মহাপাপ, খলতা, ক্রূরতা,
শ্মশান-কুক্কুরসম ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে কোলাহল,
ভেদাভেদ-দ্বন্দ্বদ্বেষে বিদলিত আত্মার মঙ্গল।

অন্যপারে রাজসিক সভ্যতার উদ্ধত হুঙ্কার,
স্রষ্টারেও তুচ্ছ গণে বৈজ্ঞানিক দম্ভ করি সার,
বিশ্বেরে বঞ্চিত করি', লেলিহান লোল লালসায়,
ইহেরে স্বর্ব্বস্ব গণি' আত্মসুখ-ভোগ শুধু চায়।

মাঝখানে দাঁড়াইয়া দীর্ঘশ্বাস তেয়াগিলে, বীর,
গর্জ্জিয়া উঠিলে বজ্রে, নেত্রে তব ধারাসারে নীর।
এই ভূ-সংসার হায়, এর মাঝে কোথা তব ঘর ?
কোথায় জুড়াবে তব সে বিরাট ব্যথিত অন্তর ?
দেখিলে চুদিকে চাহি কোথাও ত নাই তব ঠাঁই,
সর্ব্বত্যাগী হে বৈরাগী, তুমি মুক্ত সন্ন্যাসী কি তাই ?

সন্ন্যাসী সাজিলে বটে, রহিলে না পর্ব্বতে কাননে !
বসিলে না ধুনী জ্বেলে বটতলে ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনে।

লইয়া মমতামুগ্ধ মৃগনেত্র, গদ্‌গদ্ হৃদয়
কোন বনে যাবে তুমি ? আত্মমুক্তি কাম্য তব নয়।
চারিদিকে অসহায় আর্ত্ত নর ডাকে 'ত্রাহি ত্রাহি'
'জল জল,' 'বুক ফাটে,' 'প্রাণ যায়', 'দুটি অন্ন চাহি',
উঠে শুধু হাহাকার কোলাহল, ব্যর্থ আর্ত্তনাদ,
কে শুনিবে ? কে শোনাবে কৃপাসিক্ত অভয় সংবাদ ?
তাহাদের বক্ষ পিষি বলোদ্ধত চালাইছে রথ.
তব দেশবাসিগণ ঘৃণাভরে ছাড়ি যায় পথ
নাসায় বসন চাপি। ডাকে তোমা নর-নারায়ণ।
ওই জনারণ্যে তুমি তপস্থায় করিলে গমন !

ব্যথার অবধি নাই,—দুঃখ-দৈন্য অনন্ত অপার
হাহাকার করি চিত্ত খুঁজে কোথা এর প্রতিকার ?
লক্ষ আর্ত্ত শয্যা মাগে, একখানি তোমার কম্বল,
কোথা অর্থ, কোথা পথ্য, কোথা শক্তি সহায় সম্বল ?
জনতা দাঁড়ায়ে দেখে স্তব্ধ অশ্রুসিন্ধুর বেলায়,
ভাসিতে লাগিলে একা সে অকূলে প্রেমের ভেলায়।

গৈরিক-সম্বল যোগী, যত দুঃখ করিতে হরণ
পারনি, সকলি নিজে একে একে করিলে বরণ।

পুঞ্জীভূত সে বেদনা মৃত্যুসম হইল জীবনে,
প্রাণপণে দিলে ডাক শ্রুতিহীন দেশবাসিগণে।
টলিল সে বেদনায় বিধাতার উদাসী হৃদয়
মুক্তি তোমা দিল তাই,—হে সাধক মৃত্যু তব নয়।

চলে গেছ শূরবর, চলিতেছে তোমার সংগ্রাম,
সাধনা কি ব্যর্থ হ'বে ? পূরিবে না তব মনস্কাম ?
ভূমার সাফল্য পথে বিরাটের কোথা পরাজয় ?
তোমার আদর্শ মন্ত্র—লক্ষরূপে করেছে আশ্রয়,
থামিবে না যাত্রাপথে। আগাইয়া আসে সফলতা,
মধ্য পথে আলিঙ্গনে তাহাদের মিলিবার কথা।
সভ্যতার সমারোহ মন্ত্রমুগ্ধ কেশরীর মত
জগদ্ধাত্রী মাতৃশক্তি-পদতলে হবে অবনত।

আজ যারা মূঢ়, দীন, তমোহত, পতিত, লাঞ্ছিত,
জয়শ্রী লভিবে তারা মনুষ্যত্বে হইবে মণ্ডিত।
যেদিন এ ক্লৈব্য, গ্লানি, ভীরুতার হইবে বিলয়,
স্বর্গে রও, ব্রহ্মে রও, জানিব সে তোমারি বিজয়।

কবিশেখর—**শ্রীকালিদাস রায়**

শিক্ষার গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া স্বামীজি বলিয়াছেন, আমাদের শিক্ষা নেতিমূলক। পাশ্চাত্য দেশের মত আমাদের এই শিক্ষার বিপরীত শিক্ষা চাই। তাহা ছাড়া, তথ্য সংগ্রহকেই এদেশে শিক্ষা মনে করা হয়। কেবল তথ্যসংগ্রহই শিক্ষা নয়। ইহাতে মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত হয় মাত্র, ইহাতে চরিত্রগঠন হয় না। চাই আমাদের মানুষ গঠনের শিক্ষা।

শিক্ষা

এক

মানুষ গড়ার শিক্ষা

আমি যখন ইউরোপের নগরে নগরে ভ্রমণ করিতেছিলাম তখন ঐ মহাদেশের গরীব লোকদের জন্যও শিক্ষা এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সুব্যবস্থা দেখিয়া স্বদেশে দরিদ্রগণের দুরবস্থার কথা আমার মনে পড়িত। তাহাতে আমার চোখে জল আসিত। ভাবিতাম, কিসে এই পার্থক্য হইল? উত্তর পাইলাম—শিক্ষাই উক্ত পার্থক্যের মূলে। ব্রহ্ম সকলের অন্তরেই সুপ্ত আছেন—তাঁহাকে সাধনার দ্বারা জাগাইয়া তুলিতে হয়। সুশিক্ষা এবং আত্মবিশ্বাসের ফলে পাশ্চাত্য দেশের দরিদ্রগণেরও হৃদয়ের সুপ্ত ব্রহ্ম জাগিয়া উঠেন।

শিক্ষার গুরুত্ব

আইরিশ ঔপনিবেশিকগণকে নিউইয়র্কে আসিতে দেখিতাম। যখন তাহারা আসিত, তখন তাহারা পদদলিত, উদ্‌ভ্রান্তদৃষ্টি, গৃহহীন, সর্ব্বহারা, অপরিচ্ছন্ন এবং রুক্ষকেশ। হাতে একটি লাঠি এবং তাহাতে বাঁধা ছিন্নবস্ত্রের একটীমাত্র পুঁটলি তাহাদের একমাত্র সম্বল। তাহাদের চলনে সংকোচ এবং নয়নে আতঙ্ক। ছয় মাসের মধ্যেই তাহাদের এই শোচনীয় দৃশ্য বদলাইয়া যাইত। তাহারা নিঃসঙ্কোচে সোজা হইয়া চলিত, তাহাদের পোশাকও ভদ্রলোকের মত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইত এবং তাহাদের চক্ষুতে ও চলনে আর ভয় বা সঙ্কোচের চিহ্নমাত্র দেখা যাইত না। ইহার কারণ কি? আইরিশরা স্বদেশে উপেক্ষার আবহাওয়ায় পরিবেষ্টিত থাকিত। সেখানে সমগ্র প্রকৃতি তাহাকে এক বাক্যে বলিত, 'প্যাট, তোর কোন আশা নেই। তুই আজন্ম গোলাম এবং চিরদিনই তুই গোলামই থাকবি।'

জন্মকাল হইতেই এই কথা অনবরত শুনিয়া শুনিয়া প্যাটও এই বাক্যে বিশ্বাস করিত এবং প্যাটেরও ধারণা হইত সে তবে সত্যই তাহাই। এই দাস-মনোভাব—এই হীনতাবোধ তাহার মজ্জাগত হইয়া যাইত। কিন্তু আমেরিকাতে পদার্পণ করিয়া সে চতুর্দিকে শুনিল, 'প্যাট, আমরা যেমন মানুষ, তুমিও সেইরূপ মানুষ। মানুষই এ সব করেছে। আমার মত, তোমার মত মানুষই সব কর্‌তে পারে। সাহস অবলম্বন কর।'

প্যাট তাহার অবনত মস্তক তুলিয়া স্বচক্ষে দেখিল—সত্যই ত তাই। প্রকৃতি স্বয়ং যেন তাহাকে বলিতে লাগিল—'ওঠ, জাগো, এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত লক্ষ্যে না পৌঁছাও ততক্ষণ জীবনের পথে থেম না।'

আমাদের শিক্ষা ঠিক বিপরীত। ইহা নেতিমূলক

নিজের দেশে পরাধীন আইরিশের ন্যায় আমাদের ছেলেমেয়েরাও স্কুল-কলেজে নেতিমূলক শিক্ষা পায়। অবশ্য, আমাদের শিক্ষায় কয়েকটি সদগুণও আছে। কিন্তু এই শিক্ষার মধ্যে আবার এমন প্রবল বাধা ও অসুবিধা আছে যাহার জন্য সদ্‌গুণগুলি চাপা পড়িয়া যায়। প্রথমতঃ, আমাদের শিক্ষা আসল মানুষ গড়ার জন্য নয়। ইহা সম্পূর্ণরূপে নেতিমূলক। এই শিক্ষা মানুষের সর্বনাশ করে। যে শিক্ষা কেবল বলে—'না, না, হবে না, পারবে না', সে শিক্ষা মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর।

আমরা শিক্ষা পাইয়াছি যে, আমরা কিছু নই। আমাদের দেশে যে কখনও কোন মহাপুরুষ জন্মিয়াছিলেন ইহা আমরা জানিতে পারি না বলিলেই হয়। ইতিমূলক ও উৎসাহপ্রদ কোন শিক্ষাই আমরা পাই না। আমরা জানিতেই পাই না যে, আমাদের কিছু আছে বা ছিল। কি ভাবে আমাদের হাতপা চালাইতে হইবে, তাঁহাও আমাদের শিখানো হয় না।

পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া এইরূপ একটীও এমন মানুষ জন্মে নাই, যাহার মাথায় মৌলিক চিন্তার উদ্ভব হইয়াছে। আমাদের দেশের মৌলিকতাসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই হয় বিদেশে শিক্ষা পাইয়াছে, নয় ত, প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পদ্ধতির অনুবর্ত্তিতায় তাহাদের বুদ্ধির মালিন্য দূর করিয়াছে।

তথ্যসংগ্রহই শিক্ষা নয়

আধুনিক শিক্ষা মাথায় এমন কতকগুলি তথ্য ভরিয়া দেয়, যেগুলি মাথায় সর্বদা গোলমাল সৃষ্টি করে, জীবনে আদৌ কার্যকারী হয় না, সেগুলি পরিপাক লাভ করিয়া জীবনের অঙ্গীভূত হয় না। এমন কতকগুলি ভাব আয়ত্ত করিতে হইবে যাহার দ্বারা মানুষ তৈরী হয়, তাহার চরিত্র গঠিত হয় এবং জীবনের পুষ্টি সাধন হয়। যদি তুমি পাঁচটী ভাবকেও হজম করিয়া জীবন ও চরিত্রের অঙ্গীভূত করিয়া থাক, তাহা হইলে যিনি একটী সমগ্র গ্রন্থাগার কণ্ঠস্থ করিয়াছেন তাঁহার অপেক্ষা তোমার শিক্ষা হইবে অনেক বেশী। শিক্ষা বলিতে যদি সংবাদসংগ্রহ বুঝাইত তাহা হইলে গ্রন্থাগারগুলি জগতের শ্রেষ্ঠ মুনি ও আচার্য্য এবং তথ্যের অভিধানসমূহ প্রধান ঋষি বলিয়া গণ্য হইত।

একটী বিদেশী ভাষায় অন্য জাতির চিন্তারাশি মুখস্থ করিয়া তদ্দ্বারা নির্বিচারে তোমার মস্তিষ্ক পূর্ণ করিয়া এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটী উপাধি গ্রহণ করিয়া তুমি ভাবিতেছ তুমি শিক্ষিত।

তোমার জীবনের উদ্দেশ্য কি ? হয় একটা কেরানীগিরি, না হয় একটা ওকালতি, আর খুব বেশী হইলে একটা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটি (যাহা আর একপ্রকারের কেরানীগিরি)। ইহা কি ঠিক নয় ? ইহাতে তোমার নিজের বা তোমার দেশের কি কল্যাণ হইবে ? ভাল করিয়া চোখ মেলিয়া দেখ, অন্নের প্রাচুর্য্যের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ যে ভারতভূমি সেই ভারতভূমিতে আজ অন্নাভাবে কি মর্মভেদী চীৎকার উঠিয়াছে। তোমার শিক্ষা কি দেশের এই অভাব দূর করিতে পারে ? যে শিক্ষা জনসাধারণকে জীবনযুদ্ধে জয়ী হইতে সাহায্য করে না, যাহা আমাদের সৎসাহস বৃদ্ধি করে না. যাহা পরোপকারের প্রবৃত্তি জাগায় না এবং মানুষকে সিংহতুল্য সাহসী করে না, তাহা কি শিক্ষানামের যোগ্য ?

কি আমরা চাই

আমরা সেই শিক্ষা চাই যাহার দ্বারা চরিত্র গঠিত হয়, মনের জোর বাড়ে, বুদ্ধি বিকশিত হয় এবং মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে। বিদেশীয় প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে স্বদেশীয় সংস্কৃতির সকল শাখা আমরা আয়ত্ত করিতে চাই, এবং তৎসঙ্গে ইংরাজি ভাষা এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষাও আবশ্যক। আমরা চাই জীবিকামূলক শিল্পশিক্ষা এবং আমরা চাই সেই শিক্ষা যাহার দ্বারা স্বদেশী শিল্প সমৃদ্ধ হয়। শিল্পশিক্ষা পাইলে লোকে চাকুরীর জন্য এত ছুটাছুটি করিবে না এবং যাহা উপার্জন করিবে তাহার দ্বারা

স্বীয় পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করিয়াও অসময়ের জন্য কিছু সঞ্চয় করিতে পারিবে।

মানুষ গঠন করাই সকল শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। মানুষের মনুষ্যত্বের পরিপুষ্টিসাধনই সকল শিক্ষার লক্ষ্য। যাহার দ্বারা ইচ্ছাশক্তি বশীভূত, বর্ধিত ও সৎপথে চালিত হয় তাহাই শিক্ষা। আমাদের দেশে এখন আবশ্যক লোহার মত শক্ত মাংসপেশী, ইস্পাতের মত বলশালী স্নায়ু এবং অদম্য বিপুল ইচ্ছাশক্তি। এমন ইচ্ছাশক্তি আমাদের এখন চাই, যাহা বিশ্বের সকল রহস্য এবং তথ্য উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ এবং সংকল্পসিদ্ধির জন্য সমুদ্রগর্ভে ডুবিয়াও মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত। মানুষগঠনের উপযোগী ধর্মের অনুশীলন করাও চাই। যে শিক্ষা মানুষের সর্বপ্রকার জীবনগঠনের সহায়ক, সেই শিক্ষাই আমাদের আবশ্যক।

মানুষগঠনের শিক্ষা

শিক্ষাতত্ত্ব

স্বামীজি বলিয়াছেন—জ্ঞান মানুষের আত্মায় অন্তর্নিহিত থাকে। অতএব শিক্ষার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি হইতেছে অন্তঃসুপ্ত জ্ঞানকে প্রবুদ্ধ করা। চকমকি পাথরে ঘুমন্ত আগুনের মত মানবমনে জ্ঞান থাকে প্রচ্ছন্ন। তাহাকেই আবিষ্কার করিতে হইবে। প্রত্যেকেই নিজে নিজের শিক্ষক। জ্ঞান বাহির হইতে আসে না, আসে প্রেরণা। প্রত্যেক মানুষকে সাহায্য করিতে হইবে প্রেরণা দিয়া তাহার অন্তঃসুপ্ত জ্ঞানকে জাগাইয়া তুলিবার জন্য। কাহারো নিজস্ব প্রকৃতির পরিবর্ত্তন না ঘটাইয়া তাহার নিজস্ব প্রকৃতিতেই সে যাহাতে পূর্ণ মনুষ্যত্বের অধিকার লাভ করিতে পারে, সেজন্য তাহাকে অবাধ স্বাধীনতা দিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, আমের বীজে কাঁটাল ফলে না, আমের বীজ হইতেই যাহাতে ভালো আম ফলে তাহারই সহায়তা করার নামই প্রকৃত শিক্ষা।

দুই

শিক্ষাতত্ত্ব

মানুষের মধ্যে যে পূর্ণত্ব সুপ্ত আছে, তাহার বিকাশসাধনই শিক্ষা। জ্ঞান মানুষের অন্তরে নিহিত, ইহা সহজাত। কোন জ্ঞান বাহির হইতে আসে না, সমস্ত জ্ঞান ভিতরেই আছে। ইহা আত্মপ্রকাশের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। আমরা বলি, 'মানুষ জানে'। কিন্তু খাঁটি মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলা উচিত, 'মানুষ

জ্ঞান মানুষের আত্মায় অন্তর্নিহিত

আবিষ্কার করে বা আবরণমুক্ত করে।' মানবের অন্তরে অনন্ত জ্ঞানের খনি বিদ্যমান। খনির উপরের আবরণ উন্মুক্ত করিলে জ্ঞান প্রকাশিত হয়। সুতরাং যাহা আমরা শিক্ষা করি, তাহা নূতন কিছু নয়। প্রচ্ছন্ন পুরাতনকে আবিষ্কার করি মাত্র। আমরা বলি, নিউটন মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। উহা কি তাঁহার জন্য পৃথিবীর কোনও অজ্ঞাত কোণে অপেক্ষা করিতেছিল? না, তাহা নহে। উহা তাঁহার অন্তরের গূঢ়-গহন প্রদেশে নিহিত ছিল। সময় আসিতেই তিনি উহা অবগত হইলেন।

মানবজগৎ যে জ্ঞানরাশি অর্জন করিয়াছে তাহা তাহার মনেই সুপ্ত ছিল,—তাহার জাগরণ হইয়াছে মাত্র। তোমার নিজের মনেই বিশ্বের অসীম জ্ঞান-ভাণ্ডার বিরাজিত। বহির্জগৎ উপলক্ষ মাত্র হইয়া তোমার আপন মনকে শুধু অধ্যয়ন করিবার প্রেরণা দিয়াছে। আপেল ফলটির পতন দেখিয়া নিউটন স্বীয় মনোগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পূর্ব হইতেই তাঁহার মনে চিন্তারাশি একভাবে বিন্যস্ত ছিল, সেগুলি তিনি অন্য আর একভাবে গ্রথিত করিলেন। এজন্য তিনি যে নূতন সূত্র আবিষ্কার করিলেন তাহাকেই আমরা বলি মাধ্যাকর্ষণ। এই সূত্র তাঁহার মনেই লুকানো ছিল, তিনি একদিন হঠাৎ তাহার সন্ধান পাইলেন। ভূকেন্দ্রের কোন বস্তুতে ইহা নিবদ্ধ ছিল না।

পার্থিব বা আধ্যাত্মিক সকল জ্ঞানই মানুষের মনেই আছে। অনেক ক্ষেত্রে ইহা আবিষ্কৃত হয় না, আবৃত থাকে। যখন ধীরে ধীরে আবরণ সরিয়া যায়, তখন আমরা বলি, আমরা শিখিতেছি। যেমন যেমন আবরণ সরানো হয় তেমনি তেমনি জ্ঞানেরও প্রকাশ হয়। যাঁহার মন হইতে উক্ত আবরণ যত মুক্ত হইতে থাকে তিনিই তত জ্ঞানী। যাঁহার মনের উপর এই আবরণ যত পুরু, তিনিই তত অজ্ঞ। যাঁহার মন হইতে এই আবরণ সম্পূর্ণভাবে অপসৃত হইয়াছে তিনিই সর্বজ্ঞ।

শিক্ষার পদ্ধতি

চকমকি পাথরে ঘুমন্ত আগুনের মত মানবমনে জ্ঞান থাকে লুকানো। চকমকি পাথরে যেমন ঘর্ষণের প্রয়োজন হয়, ঐ জ্ঞানকে প্রবুদ্ধ করিতে হইলে তেমনি বাহির হইতে উদ্দীপনার প্রয়োজন হয়। সমস্ত জ্ঞান এবং সকল শক্তি থাকে অন্তরে সুপ্ত। যাহাকে আমরা শক্তি বা প্রাকৃতিক রহস্য বলি তাহাও অন্তরেই অবস্থিত। মানবাত্মা হইতেই সকল জ্ঞানের আবির্ভাব। অনাদি কাল হইতে যে জ্ঞানসমুদ্র মানবাত্মায় অন্তর্নিহিত আছে মানুষ তাহাকেই আবিষ্কার করে বা প্রকাশ দান করে। মানুষ জ্ঞানের স্রষ্টা নয়, জ্ঞানের আবিষ্কারক।

প্রকৃতপক্ষে একজন অন্যের কাছে শিক্ষা পায় না। আমাদের

প্রত্যেকেই নিজেই নিজের শিক্ষক। বাহিরের শিক্ষক উদ্দীপনা দেয় মাত্র। সে উদ্দীপনা ভিতরের শিক্ষককে জাগাইয়া তুলে এবং জ্ঞানের উদ্বোধনে সহায়তা করে। তখন সকল বিষয় আমাদের চিন্তা ও অনুভবশক্তির দ্বারা স্পষ্টভাবে বোধগম্য হয় এবং আমরা সেগুলিকে আত্মার আলোকে উপলব্ধি করি।

শিশু নিজেই নিজের শিক্ষক

যে বৃহৎ বটগাছটি বহু বিঘা জমিকে ছায়ায় ঢাকিয়া অবস্থিত আছে, তাহা একটি সর্ষপের এক অষ্টমাংশতুল্য অণুসদৃশ বীজে একদিন নিহিত ছিল। ক্ষুদ্র বীজ হইতে বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হইবার জন্য যে বিপুল শক্তি আবশ্যক তাহাও কণাতুল্য বীজে নিবদ্ধ ছিল। আমরা জানি, অসাধারণ, অপরিমেয় প্রতিভাও কুণ্ডলীবদ্ধ হইয়া অণুবৎ জীবকোষে নিহিত থাকে। ইহা প্রহেলিকা বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু ইহাই পরীক্ষিত সত্য।

আমাদের প্রত্যেকেই এক একটি জীবকোষ হইতে উদ্ভূত এবং আমরা জীবনে যে সকল শক্তির অধিকারী হই, সেই সমস্তই তন্মধ্যে কুণ্ডলীকৃত ছিল। আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করিয়া দেহ পুষ্ট করি তুমি কি বলিবে ঐ শক্তি সেই খাদ্য হইতে আসে ? যদি তুমি আহার্য্যবস্তু কোন স্থানে পর্বতাকারে স্তূপীকৃত কর উহা হইতে কি সে শক্তি পাইবে ? শক্তি জীবকোষেই অব্যক্তভাবে বর্ত্তমান ছিল,

অন্যত্র নহে। মানুষ জানুক, আর নাই জানুক, তাহার আত্মা অনন্ত শক্তির আধার। এসম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান জন্মিলেই সেই শক্তির বহিঃপ্রকাশ সম্ভব হয়।

মানবাত্মায় যে দিব্য জ্যোতিঃ বিদ্যমান আছে তাহা অধিকাংশ লোকের মধ্যে একটা আবরণ দিয়া আচ্ছাদিত। ইহা লোহার পিপের মধ্যে রক্ষিত প্রদীপের ন্যায়। ইহার একটি রশ্মিও দুর্ভেদ্য আবরণ ভেদ করিতে পারে না। শুচিতা এবং নিঃস্বার্থতার অনুশীলনের দ্বারাই এই পুরু আবরণ পাতলা হইতে থাকিবে। অবশেষে উহা কাচের ন্যায় স্বচ্ছ হইবে, লোহার পিপে কাচের ডোমে পরিণত হইবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবনে ঐ লোহার পিপে কাচের ডোমে পরিণত হইয়াছিল। তাই তাঁহার অন্তরস্থ দিব্য জ্যোতিঃ পূর্ণ ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছিল। সে জ্যোতিঃ তাঁহার আত্মা হইতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

একটি চারাগাছকে যেমন জোর করিয়া বাড়ানো যায় না, একটী শিশুকেও তেমনি চেষ্টা করিয়া শিক্ষা দেওয়া যায় না।

স্বপ্রকৃতিতে পরিবর্দ্ধনের সহায়তা

চারাগাছটি স্বীয় স্বভাব অনুসারে বর্ধিত হয়। শিশুও নিজেই শিক্ষালাভ করে। কিন্তু তুমি শিশুকে তাহার শিক্ষালাভের পথে সাহায্য করিতে পার। যাহা তুমি করিতে পার তাহা সংযোগাত্মক নহে,

বিয়োগাত্মক। তুমি কেবলমাত্র বাধাগুলি অপসারণ করিতে পার। চারিপাশের অবস্থাকে অনুকূল করিয়া তুলিতে পার। তখন স্বভাবতই শিশুর জ্ঞানের বিকাশ হইতে পারে। চারাগাছকে বাড়িবার কাজে সহায়তার জন্য মাটিটা একটুকু আল্‌গা করিয়া দাও, তাহাতে তাহার শিকড় চালানোর সুবিধা হইবে, নূতন নূতন অঙ্কুর ও শাখামূল বাহির হইতে পারিবে। উহার চারিদিকে বেড়া দাও, দেখ, যেন কেহ ইহার কোন অনিষ্ট করিতে না পারে। দেহগঠনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান ক্ষুদ্র বৃক্ষশিশুকে যোগাইতে পার। উহার জন্য মাটি, জল এবং বায়ু প্রভৃতি যাহা আবশ্যক তাহার যোগান দাও। তোমার কাজ সেইখানেই শেষ। বৃদ্ধির জন্য যাহা কিছু ইহা চায়, সেই সমস্ত ইহা স্বীয় স্বভাবের দ্বারাই সংগ্রহ করিবে। সংগৃহীত উপাদান পরিপাক করিয়া ইহা স্বীয় স্বভাববশেই বর্ধিত হইবে।

শিশুর শিক্ষাও এই প্রকারে হয়। অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি এবং প্রতিকূল অবস্থার অপসারণই শিক্ষা। শিশু স্বয়ং শিক্ষিত হয়। যে শিক্ষক মনে করেন যে, তিনিই শিক্ষা দেন, সেই শিক্ষক ছাত্রের ইষ্ট ত করেনই না—বরং অনিষ্টই করেন। মানুষের অন্তঃস্বরূপটী জ্ঞানময়। ইহার উদ্বোধন আবশ্যক। ইহার উদ্বোধনে সাহায্য করাই শিক্ষকের কার্য। যাহাতে বালকগণ তাহাদের হস্ত, পদ, কর্ণ

ও চক্ষুর যথাযোগ্য ব্যবহারের জন্য স্বীয় বুদ্ধি প্রয়োগ করিতে পারে আমাদের সেইটুকুই করিতে হইবে।

কোন মূর্খ বন্ধুর পরামর্শে জনৈক ব্যক্তি তাহার গাধাটিকে পিটাইয়া ঘোড়ায় পরিণত করিতে চাহিয়াছিল। যে শিক্ষাপদ্ধতি উক্ত প্রকারে বালকগণকে শিক্ষা প্রদান করিতে চায় তাহা গাধা পিটাইয়া ঘোড়া বানাইতে চায়। সেই পদ্ধতি বিসর্জন দিতে হইবে। পিতামাতা বা অভিভাবকগণ বালকগণকে অযথা শাসন করেন বলিয়া আমাদের বালকগণ আত্মবিকাশের স্বাধীন সুযোগ পায় না। প্রত্যেকের মনোবৃত্তির মধ্যে অসংখ্য প্রবণতা আছে, এই প্রবণতাগুলিকে পরিণতি লাভের জন্য, সার্থকতা লাভের জন্য সর্ব্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দিতে হইবে। ঐ প্রবণতাগুলিতেই শিশুর স্বধর্ম নিবদ্ধ আছে। যাহাতে শিশুর স্বধর্মচ্যুতি না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। শাসনের দ্বারা ইহা সম্ভব নয়, সস্নেহ পরিচালনাই প্রয়োজন। সংস্কারসাধনের প্রচণ্ড চেষ্টা সংস্কারসাধনের বাধারই স্বষ্টি করে, সর্ব্বদাই বিপরীত ফল প্রসব করে। যদি তুমি কোন শিশুকে সিংহ হইতে না দাও, তবে সে শৃগাল হইবেই।

অবাধ অধিকার

ইতিমূলক ভাব বিতরণ কর। নেতিমূলক চিন্তাগুলি মানুষকে দুর্বল করিয়া ফেলে। তোমরা কি লক্ষ্য কর না,

যেখানে পিতামাতা তাঁহাদের সন্তানগণকে সর্বদাই ইতিমূলক ভাব লেখাপড়া করার জন্য তাড়া দিতেছে এবং তাহাদিগকে বলিতেছে—'তোমরা কিছুই শিখিতে পারিবে না, তোমরা বোকা' ইত্যাদি, সেখানে বালকগণ অধিকাংশ স্থলে তদ্রূপই হইয়া যায় অর্থাৎ নির্বোধ ও মূর্খ ই হইয়া দাঁড়ায়? পক্ষান্তরে, যদি তুমি তাহাদিগকে মিষ্ট কথা বল, এবং উৎসাহিত কর তাহারা কালে নিশ্চয়ই উৎকর্ষ লাভ করিবে। যদি তুমি ইতিমূলক ভাব প্রচার করিতে পার, তবেই ছেলে মানুষ হইবে এবং নিজের পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে শিখিবে। কি ভাষায়, কি সাহিত্যে, কি কবিতায়, কি শিল্পে,—প্রত্যেক বিষয়েই মানুষ তাহাদের চিন্তা ও কার্য্যে যে সকল ভুল করিতেছে, শুদ্ধ সেগুলি দেখাইয়া দেওয়াই শিক্ষা নহে। যে উপায়ে তাহারা ঐগুলি সম্যক্‌রূপে নির্ভুলভাবে আয়ত্ত করিতে পারে তাহাই শিক্ষা দিতে হইবে!

ছাত্রের নিজস্ব প্রয়োজন অনুসারেই শিক্ষাদানকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। সকল ছাত্রের প্রয়োজন এক নয়, কাজেই প্রকৃত শিক্ষা দিতে হইলে নির্বিচারে বহু শ্রেণীর ছাত্রকে একসঙ্গে শিক্ষা দেওয়া যায় না। প্রত্যেকের প্রয়োজন কি, প্রত্যেকের দুর্ব্বলতা কোথায় তাহা শিক্ষককে বিশেষ অভিনিবেশের সঙ্গে লক্ষ্য করিয়া তাহাকে তদনুযায়ী শিক্ষা দিতে হইবে। অতীত

জীবন ছাত্রগণের রুচি, প্রকৃতি ও প্রবণতাকে একটা বিশিষ্ট রূপ দিয়াছে—সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদের শিক্ষা দান করিতে হইবে।

যে যে-স্থানে দণ্ডায়মান, তাহাকে সেই স্থান হইতে সম্মুখের দিকে আগাইবার পথে ঠেলিয়া দাও। আমরা দেখিয়াছি, যাহারা আমাদের নিকট অত্যন্ত অযোগ্য বিবেচিত হইত, তাহাদিগকে শ্রীরামকৃষ্ণ উপরিউক্ত প্রণালীতে শিক্ষা দিয়া কিরূপে তাহাদের সমগ্র জীবন পরিবর্তিত করিয়া দিতেন। তিনি কাহারও নিজস্ব রুচিপ্রকৃতিকে নষ্ট করিতেন না। পতিত অধমকেও তিনি আশা ও উৎসাহ প্রদানে উন্নত করিতেন।

স্বাধীনতাই শিক্ষার প্রথম সোপান। ইহা অন্যায়, সহস্র বার অন্যায়, যদি তোমাদের মধ্যে কেহ সাহস করিয়া বলে, 'আমি এই বালক ও নারীর মুক্তি সাধন করিতে পারি।' তুমি সরিয়া দাঁড়াও। তাহারা তাহাদের সমস্যাগুলি নিজেরাই সমাধান করিবে। তুমি নিজেকে সবজান্তা মনে কর কেন? তোমার কি দুঃসাহস যে, তুমি খোদার উপরও খোদকারি চালাইতে চাও? তুমি কি জান না, প্রত্যেক মানবের আত্মাই ঈশ্বরের আত্মা—পরমাত্মা। প্রত্যেককে দেবতা বলিয়া ভাব। সেবাতেই তোমার অধিকার। যদি তোমার অধিকার থাকে ঈশ্বরের সন্তান-জ্ঞানে সকলের সেবা কর! যদি তাঁহার সন্তানগণের কাহাকেও সাহায্য

করিবার সুযোগ ঈশ্বর দেন, তবে তুমি ধন্য। তোমার সেই সৌভাগ্য-লাভ হইয়াছে বলিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করা উচিত। কত লোকইত সে সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত! ভগবানের পূজা মনে করিয়াই এই সেবা কর। অজ্ঞকে শিক্ষাদানও সেবা। নিজেকে শিক্ষক মনে না করিয়া সেবক মনে কর।

শিক্ষার একমাত্র পদ্ধতি

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে যে প্রেরণার কথা বলা হইয়াছে তাহার প্রধান অঙ্গ হইতেছে একাগ্রতার সঞ্চার। শিক্ষার্থীর বিক্ষিপ্ত চিত্তকে সংক্ষিপ্ত করিয়া আনার নাম একাগ্রতা সঞ্চার। একাগ্রতাই জ্ঞান-ভাণ্ডারের একমাত্র চাবি। একাগ্রতার ফল অসামান্য। জ্ঞানের রাজ্যে যাহারা সাফল্য লাভ করিয়াছে তাহারা প্রথমে একাগ্রতার সাধনা করিয়াছে। মানুষে পশুতে যে প্রভেদ তাহা একাগ্রতার তারতম্যে। জ্ঞানের রাজ্যে মানুষে মানুষে যে তফাৎ তাহাও একাগ্রতার তারতম্যেই ঘটে। অতএব শিক্ষার্থীর জীবনে একাগ্রতা সঞ্চারই শিক্ষার একমাত্র পদ্ধতি।

তিন

শিক্ষার একমাত্র পদ্ধতি

জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় মনের একাগ্রতা। মনের একাগ্রতাসাধনই শিক্ষার প্রধান অঙ্গ বা সারাংশ। জ্ঞানার্জনের জন্য নিম্নতর মানব হইতে উচ্চতম যোগীকেও এই একই উপায় অবলম্বন করিতে হয়।

একাগ্রতা

রসায়নাগারে রাসায়নিক সাধক মনের সমুদয় শক্তি একাগ্র করেন তাঁহার গবেষণায়। তিনি সমগ্র মানসিক শক্তি এক কেন্দ্রে সংহত করিয়া উপাদানসমূহের উপর প্রয়োগ করেন। তখন উপাদানগুলির বিশ্লেষণ এবং তজ্জনিত জ্ঞান তাঁহার অধিগত হয়। জ্যোতির্বিদও মনের সর্বশক্তি একাগ্র করিয়া উপাদানগুলিকে এক কেন্দ্রে সংহত করেন। তিনি দূরবীক্ষণযন্ত্রের মধ্য দিয়া লক্ষ্য বস্তুর

উপর তাহা প্রতিফলিত করেন। তখন তারকাসমূহ ও গ্রহমণ্ডলগুলি তাঁহার সম্মুখে আবর্তিত হইয়া নিজ নিজ রহস্য উদ্‌ঘাটন করে। সকল ক্ষেত্রেই এই পদ্ধতিই প্রয়োগ করিতে হয়। আচার্য্যের আসনে উপবিষ্ট অধ্যাপক, পুস্তকপাঠরত ছাত্র —প্রত্যেক জ্ঞানান্বেষী মানবকে এই উপায়েই জ্ঞান সাধন করিতে হয়।

একাগ্রতার শক্তি যত অধিক হয়, জ্ঞানও তত অধিক অর্জিত হয়। হীনতম চর্মকার অধিকতর একাগ্রতার প্রয়োগে উত্তম পাদুকা তৈয়ারী ও মেরামত করিতে পারে। একাগ্রমনা পাচক উৎকৃষ্ট আহার্য্য পাক করিতে পারে। ধনার্জ্জনেই হউক আর জ্ঞানার্জ্জনেই হউক আর ঈশ্বরোপাসনাতেই হউক—যে-কোন কর্মে একাগ্রতাশক্তি যত গভীর হইবে, সে সাধনাও তত উৎকৃষ্টরূপে সম্পন্ন হইবে। এই একটি মাত্র আহ্বানে—একটি মাত্র করাঘাতে প্রকৃতির সকল দ্বার উন্মুক্ত হয় এবং সেই দ্বার দিয়া আলোক-স্রোত প্রবাহিত হয়।

একাগ্রতার শক্তি

সাধারণ মানবের শতকরা নব্বই জন চিন্তাশক্তির অপচয় করে। সেইজন্য তাহারা অহরহঃ ভুল করিয়া বসে। শিক্ষিত মানব বা সুনিয়ন্ত্রিত মন কখনও সে ভুল করে না। মানব ও পশুর মধ্যে আসল প্রভেদ এই একাগ্রতাশক্তির পার্থক্যে। পশুর একাগ্রতাশক্তি অতি

শক্তির তারতম্য

সামান্য। পশুশিক্ষকগণ এই বিষয়ে বড়ই অসুবিধা অনুভব করেন। কারণ, পশুকে যাহা শিখাইয়া দেওয়া হয় তাহা সে কেবলই ভুলিয়া যায়। কোন বিষয়ে বহুক্ষণ সে মনঃসংযোগ করিতে পারে না। মানব ও পশুতে পার্থক্য এইখানেই। মনঃসংযম শক্তির তারতম্যেই মানবে মানবেও পার্থক্যসৃষ্টি হইয়াছে। নিম্ন স্তরের মানবের সহিত উচ্চস্তরের মানবের তুলনা কর, দেখিবে একাগ্রতার পরিমাণের জন্যই উভয়ের মধ্যে এত প্রভেদ।

ফল

যে কোন কর্মক্ষেত্রে একাগ্রতার পরিণতি হয় সম্পূর্ণ সফলতায়। একাগ্রতাই সাফল্যলাভের নিদান। শিল্প, সংগীত প্রভৃতিতে উচ্চাঙ্গের সফলতা একাগ্রতার অমোঘ ফল। মন একাগ্র হইয়া বহির্জগৎ হইতে ফিরিয়া নিজের মধ্যে নিবিষ্ট হইলে অন্তর্জগতের সব কিছুর উপর আমাদের প্রভুত্ব জন্মে—আর তাহাদের প্রভুত্ব স্বীকার করিতে হয় না, তাহাদের দাসত্ব করিতে হয় না। গ্রীকগণ বহির্জগতে তাহাদিগের একাগ্রতা প্রয়োগ করিয়াছিলেন। উহার ফলে তাঁহারা শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতিতে উৎকর্ষ লাভ করিলেন। হিন্দুগণ অন্তর্জগতে, অদৃশ্য অধ্যাত্মলোকে মনঃসংযোগ করিয়া যোগবিজ্ঞানে উন্নত হইলেন। জগৎ তাহার রহস্যগুলিকে গোপন করিয়া রাখিতে চায় না। সে সতত অন্তর্গূঢ় রহস্যগুলিকে

প্রকাশ করিবার জন্যই উদ্‌গ্রীব। কেবল আমাদিগকে দ্বারে করাঘাত করিতে শিখিতে হইবে। শিখিতে হইবে, কেমন করিয়া ঠিক আঘাতটি হানিতে হয়। ঐ আঘাতের শক্তি ও প্রবলতা একাগ্রতার মধ্য দিয়াই আসে।

জ্ঞানভাণ্ডারের একমাত্র চাবিকাঠি হইল একাগ্রতা-শক্তি। দেহের বর্তমান অবস্থায় আমাদের মন অতিমাত্রায় বিক্ষিপ্ত।

জ্ঞানভাণ্ডারের একমাত্র চাবি

বিবিধ বিষয়ে মন স্বীয় শক্তিকে শতধা ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিতেছে। আমাদের মানসিক শক্তি তাহাতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। যখনই আমরা কোন বিষয়ে চিন্তা করি এবং মনকে যখন জ্ঞানের একটী মাত্র পদার্থে নিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাই, তখনই সহস্র সহস্র অবাঞ্ছনীয় আবেগ মস্তিষ্কে প্রবেশ করে, সহস্র সহস্র চিন্তা মনকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয় ও অশান্তির সৃষ্টি করিতে থাকে। রাজ-যোগের সমগ্র আলোচ্য বিষয়,—কিরূপে মনের বিক্ষিপ্ত প্রকৃতিকে রোধ করিয়া কি উপায়ে মনোবৃত্তিগুলিকে সংহত করিয়া উহাকে স্বায়ত্তে আনা যায়। ধ্যানের অনুশীলনের দ্বারা মনের সেই একাগ্র অবস্থা লাভ করা যায়।

আমার মতে মনের একাগ্রতাসাধনই শিক্ষার সার কথা, তথ্যসংগ্রহ শিক্ষার পক্ষে খুব বড় কথা নহে। যদি আমাকে পুনরায় শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়, আমি আদৌ পাঠের দ্বারা

তথ্যসমূহ সংগ্রহ করিব না। আমি তখন মনের একাগ্রতা ও নির্লিপ্ততা অনুশীলন করিয়া এই ভাবে পরিপূর্ণাঙ্গ মনোযন্ত্রের সাহায্যে ইচ্ছামত তথ্যরাজি সংগ্রহ করিব।

দ্বাদশবর্ষকাল অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য পালন করিলে অসীম শক্তি সঞ্চারিত হয়। অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য অসাধারণ মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি দান করে। কামনা দমন করিতে পারিলে আশাতীত ফল পাওয়া যায়। ইন্দ্রিয়ের শক্তিকে আত্মিক শক্তিতে রূপান্তরিত কর। এই শক্তি যত তীব্র হইবে, ততই ইহার দ্বারা অধিক কাজ হইবে। ইন্দ্রিয়ের সংযমের অভাবে আমাদের দেশে সব কিছুই ধ্বংসোন্মুখ হইয়াছে। কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন দ্বারা অতি অল্প সময়ে সকল বিদ্যাই আয়ত্ত করা যায়। একবার মাত্র শুনিলে বা জানিলে তখন ভুলিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত ধর্মবিষয়ক কোন শক্তি আসিতে বা থাকিতে পারে না। ব্রহ্মচর্য্য মানবকে অদ্ভুতরূপ সংযমী করে। জগতে ধর্মগুরুগণ অসাধারণ সংযমী ছিলেন এবং ইহাই তাঁহাদিগকে মহা-শক্তিশালী করিয়াছিল।

একাগ্রতার জন্য ব্রহ্মচর্য্যের প্রয়োজনীয়তা

প্রত্যেক বালককে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাস করিতে শিক্ষা দিতে হইবে এবং তখনই, কেবল তখনই, তাহার হৃদয়ে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা জন্মিবে। সকল সময় ও সকল অবস্থায়—চিন্তায়, কার্য্যে,

ও বাক্যে বিশুদ্ধতার অনুশীলনের নামই ব্রহ্মচর্য্য। অপবিত্র চিন্তা, অপবিত্র আচরণের মতই পরিত্যাজ্য। ব্রহ্মচারিগণকে চিন্তায়, বাক্যে ও কার্য্যে অবশ্যই পবিত্র হইতে হইবে।

প্রকৃত শ্রদ্ধার ভাব পুনরায় আমাদিগের মধ্যে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। আত্মবিশ্বাস পূর্ণভাবে জাগরিত করিতে হইবে।

শ্রদ্ধা সকল উৎকর্ষের ভিত্তি

তখনই আমাদের দেশের যাবতীয় সমস্যার সমাধান ধীরে ধীরে আমাদিগের দ্বারাই নিষ্পন্ন হইতে পারিবে। আমরা এই শ্রদ্ধাই চাই। মানবে মানবে যে বিভেদ, তাহার মূলে এই শ্রদ্ধারই তারতম্য, অন্য কিছু নহে। এই শ্রদ্ধাই একজন মানবকে করে মহান্ ও দুর্জয়, আর ইহার অভাবই অন্যকে করে হীন ও দুর্বল। আমার গুরুদেব বলিতেন, যে ব্যক্তি নিজেকে দুর্বল ভাবে, সে দুর্বলই হইবে। ইহা পরম সত্য। এই শ্রদ্ধা অবশ্যই তোমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হওয়া চাই। পাশ্চাত্য জাতিসমূহের আবিষ্কৃত জড়শক্তির যে সব কার্য্যাবলী তোমরা দেখিতেছ তাহা এই শ্রদ্ধারই বিকাশ। কারণ, তাহারা স্বীয় দৈহিক শক্তিতে বিশ্বাসী। তোমরা যদি আত্মার শক্তিতে বিশ্বাস কর তাহা হইলে অনেক বেশী ফল লাভ করিবে। দৈহিক শক্তিতে বিশ্বাসের ফলই যদি এত অদ্ভুত হয়, আত্মিক শক্তিতে বিশ্বাসের ফল যে কি অভাবনীয় হইবে তাহা ভাবিয়া দেখ।

আমি তোমাদের একটি মাত্র বিষয় বুঝাইতে ইচ্ছা করি, সেটী এই—দিবারাত্র যে নিজেকে অযোগ্য ও তুচ্ছ মনে করে, তাহার দ্বারা কোন মহৎ কাজ হইতে পারে না। যদি কোন ব্যক্তি দিবারাত্র ভাবে যে,—সে হতভাগ্য হীন ও নগণ্য, তবে সে তাহাই হইয়া যায়। যে যাহা ভাবে সে তাহাই হয়। যদি তোমরা ভাব, 'আমিই সেই আত্মা', 'আমিই সেই আত্মা' তাহা হইলে তোমরা অজেয় ও অমর হইবে। এই মহাসত্য তোমাদের স্মরণ রাখা উচিত। আমরা সর্বশক্তিমানের সন্তান, অসীমের স্ফুলিঙ্গ —দিব্য বহ্নিকণা। তবে কিরূপে আমরা অযোগ্য হইতে পারি? আমরাই সব-কিছু। আমরাই অসম্ভব সম্ভব করিতে সমর্থ, আমরা সব করিতে পারি। আমাদিগের পিতৃপিতামহের অন্তরে এইরূপ জ্বলন্ত আত্মবিশ্বাস ছিল। অদম্য আত্মপ্রত্যয় তাঁহাদের ছিল বলিয়াই তাঁহারা সেই শক্তির গুণে সভ্যতার প্রগতির পথে এত দূর আগাইয়াছিলেন। যদি কোথাও বংশানুক্রমিক সংস্কৃতিধারার অধোগতি হইয়া থাকে, যদি কোথাও গলদ বাহির হইয়া থাকে, তোমরা জানিও,—যেদিন আমরা আত্মবিশ্বাস হারাইয়াছি সেইদিন হইতে আমাদের অধঃপতিত অবস্থার সূত্রপাত হইয়াছে।

যে যাহা চিন্তা করে সে তাহাই হয়

শ্রদ্ধা বা অকৃত্রিম আত্মবিশ্বাসের বাণী প্রচার করাই আমার

জীবনব্রত। তোমাদিগকে বারবার বলিতেছি, এই আত্মবিশ্বাস মানবতার অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। জানিও, একজন ক্ষুদ্র জল বুদ্‌বুদের মত ও আর একজন পর্ব্বতপ্রমাণ তরঙ্গের মত হইলেও, ঐ তরঙ্গ ও বুদ্‌বুদ উভয়ের পিছনেই আছে সীমাহীন সমুদ্র। ঐ সীমাহীন সমুদ্র যেমন আমার, তেমনি তোমারও অধিষ্ঠান। ঐ অসীম জীবনসমুদ্র, শক্তিসমুদ্র, ধর্মসমুদ্র, আমার পক্ষে যেমন তোমার পক্ষেও তেমনি। অতএব বন্ধুগণ, তোমাদের সন্তান সন্ততিগণকে জন্ম হইতেই এই জীবনপ্রদ, মহান্, গৌরবময়, অনন্যসাধারণ তত্ত্ব শিক্ষা দাও।

আমাদের দেশের প্রাচীনকালের শিক্ষা-পদ্ধতির আলোচনা করিয়া স্বামীজি বলিয়াছেন—ছাত্রের পক্ষে কায়মনোবাক্যে পবিত্রতা, প্রকৃত জ্ঞানতৃষ্ণা ও অধ্যবসায়ের অনুশীলন আবশ্যক। শিক্ষকের চরিত্রও নিষ্কলঙ্ক ও পবিত্র হওয়া চাই। ছাত্র শ্রদ্ধাবান্ হইলে জ্ঞান লাভ করে—শিক্ষকেরও শ্রদ্ধেয় হওয়া চাই।

চার

শিক্ষক ও ছাত্র

আমার মতে গুরুগৃহই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। কেবল শিক্ষকের মুখে উপদেশ শুনিয়া শিক্ষা সম্পূর্ণাঙ্গ হয় না। শিক্ষকের ব্যক্তিগত জীবনের সংস্পর্শে না আসিলে প্রকৃত শিক্ষা লাভ হয় না। বাল্যকাল হইতেই এমন পুরুষের সংসর্গে বা কাছে থাকা চাই যাঁহার চরিত্র জ্বলন্ত অনলের ন্যায় উজ্জ্বল, দীপ্ত এবং ছাত্রের সম্মুখে থাকা চাই উচ্চতম শিক্ষকতার জীবন্ত আদর্শ।

শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষকের ব্যক্তিগত জীবনের গুরুত্ব

চোখের সম্মুখে একটা বড় আদর্শ না থাকিলে ছাত্রের জীবন গঠন হয় না। প্রাচীন কালে আমাদের দেশে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীরাই আচার্য্যের আসন গ্রহণ করিতেন। শিক্ষাদানের গুরু দায়িত্ব বর্তমানকালেও আত্মত্যাগী পুরুষদিগের হস্তেই ন্যস্ত হওয়া উচিত।

শিক্ষা

ভারতের শিক্ষার প্রাচীন পদ্ধতি, আধুনিক পদ্ধতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের ছিল। তখন ছাত্রদিগকে বেতন দিতে হইত না। বিদ্যাকে এত পবিত্র মনে করা হইত যে, কেহ ইহাকে অন্যান্য পণ্য দ্রব্যের মত বিক্রয় করিতে চাহিতেন না। বিদ্যা বিক্রয় করায় ধর্মহীন হয় বলিয়াই সেকালের গুরুদের বিশ্বাস ছিল। বিদ্যা বিনামূল্যেই বিতরণ করা হইত।

শিক্ষার প্রাচীন পদ্ধতি

কোন পারিশ্রমিক না লইয়াই আচার্য্যগণ পূর্বে ছাত্রগণকে বিদ্যাদান করিতেন। শুধু ইহাই নহে, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে অধিকাংশ ছাত্রদিগকে আহার ও পরিচ্ছদ যোগাইতেন। এইরূপ আচার্য্যগণের পৃষ্ঠপোষকতা করিবার জন্য ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দান করিতেন এবং তাঁহারাও সেই দানের সাহায্যে ছাত্রদিগের ভরণপোষণ চালাইতেন।

পুরাকালের ছাত্রগণ সমিৎপাণি হইয়া গুরুর আশ্রমে গমন করিত এবং গুরু ছাত্রের যোগ্যতা পরীক্ষা করিয়া শিষ্যরূপে গ্রহণ করিতেন এবং বেদাদি শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। কায়, মন ও বাক্যে সংযম-সাধনার প্রতীক-স্বরূপ আচার্য্য তখন ছাত্রের কটিদেশে তিন বেড় মুঞ্জতৃণের মেখলা পরাইয়া দিতেন। ইহার নাম মৌঞ্জীবন্ধন সংস্কার।

শিক্ষক ও ছাত্র

শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই কতকগুলি বাধ্যতামূলক নীতি পালন করা প্রয়োজন। ছাত্রের পক্ষে পবিত্রতা, প্রকৃত জ্ঞানতৃষ্ণা এবং অধ্যবসায়ের অনুশীলন প্রয়োজন। চিন্তায়, বাক্যে এবং কর্মে শুচিতাসাধন ছাত্রের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। আমরা যাহা চাই তাহাই পাই। জ্ঞানতৃষ্ণা সম্বন্ধে ইহাই প্রাচীন সূত্র। মনঃপ্রাণ দিয়া আমরা যাহা চাই তাহার অতিরিক্ত—তাহা ছাড়া অন্য কিছু—আমরা পাইতে পারি না। অতএব আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে উচ্চ করিতে হইবে। যত দিন উচ্চ আকাঙ্ক্ষা সত্যসত্যই প্রবুদ্ধ না হয় এবং লক্ষ্যবস্তু যতদিন অধিগত না হয় ততদিন আমাদের নীচ বৃত্তি-গুলির সহিত অবিরত দ্বন্দ্ব ও নিরন্তর সংগ্রাম করিতে হইবে। যে ছাত্র এইরূপ অধ্যবসায়সহকারে ব্রতপালন আরম্ভ করে, তাহার প্রয়াস অবশ্যই অবশেষে সাফল্য-মণ্ডিত হয়।

শিক্ষার্থীর গুণ

শিক্ষক-নির্বাচন সম্বন্ধে আমাদিগকে লক্ষ্য করিতে হইবে, তিনি ধর্মশাস্ত্রের যথার্থ মর্ম অবগত আছেন কিনা। সমগ্র জগতের নরনারী বাইবেল, বেদ কিংবা কোরান পাঠ করে। কিন্তু এইগুলি তাহাদের কাছে কেবল পদসমষ্টি, বাক্য-বিন্যাসরীতি, শব্দসাধন ও ব্যাকরণ শাস্ত্র মাত্র; ধর্মের শুষ্ক কঙ্কালস্বরূপ।

শিক্ষক ও তাঁহার তিনটি বিশিষ্ট গুণ

ধর্ম্মশাস্ত্রের বহিরঙ্গ ভেদ করিয়া তাহার অন্তরঙ্গে কয়জন

প্রবেশ করে? যে শিক্ষক অমিতভাষী, ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অতিমাত্রায় বাক্য ব্যবহার করেন এবং মনকে বাক্যের ছটায় ও আড়ম্বরে দূরে লইয়া যাইতে চাহেন, তিনি শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম হারাইয়া ফেলেন। কেবলমাত্র শাস্ত্রের মর্মার্থজ্ঞানই মানুষকে প্রকৃত শিক্ষকের পদের অধিকারী করিয়া তুলে।

শিক্ষকের চরিত্র নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক হওয়া চাই। শিক্ষকের পক্ষে দ্বিতীয় বিচার্য্য বস্তু তাঁহার নিষ্পাপতা। 'শিক্ষকের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব বিচার কেন করিব?' এই প্রশ্ন অনেক সময় উঠে। এই উক্তি যুক্তিসঙ্গত নহে। শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদান উভয়ের জন্য একান্ত প্রয়োজন দেহ ও মনের পবিত্রতা। শিক্ষককে অবশ্যই সর্বাঙ্গীণভাবে কায়মনোবাক্যে পবিত্র হইতে হইবে এবং কেবল তখনই তাঁহার মুখের কথায় শক্তিসঞ্চার হইবে। প্রকৃত কর্তব্য ছাত্রের জীবনে শক্তি সঞ্চার করা, কিছু-না-কিছু ছাত্রের জীবনে সঞ্চালিত করা, কেবলমাত্র ছাত্রের সুপ্ত বোধশক্তি এবং অন্যান্য বৃত্তিগুলির প্রবোধন করা নহে।

এমন একটি প্রভাব শিক্ষকের জীবন হইতে ছাত্রের জীবনে প্রেরিত হইবে—যাহা রীতিমত বাস্তব এবং উপলব্ধিগম্য। সেইজন্য শিক্ষককে অবশ্যই চরিত্রবান্ হইতে হইবে অর্থাৎ শিক্ষকের চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে।

তৃতীয় নীতি—শিক্ষকের জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে। অর্থ, মান

বা যশের কাঙাল হইয়া অন্তরে কোন স্বার্থের ভাব পোষণ করিয়া শিক্ষকের শিক্ষা-দানে ব্রতী হওয়া উচিত নহে। শিক্ষক কেবল প্রেমপরবশ হইয়াই বিদ্যাদান করিবেন, বৃহৎ মনুষ্যসমাজের প্রতি প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে কর্ত্তব্যপালন করিয়া যাইবেন। কেবল প্রেমের মধ্য দিয়াই আধ্যাত্মিক শক্তি অন্যের মধ্যে সঞ্চার করা সম্ভব। লাভ বা নামের আকাঙ্ক্ষারূপ কোন স্বার্থাভিসন্ধি থাকিলে তাহা শিক্ষার বাহনকে তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করিবে, প্রেমসূত্রকে ছিন্ন করিবে।

পিতৃপুরুষ এবং তাঁহার বংশধরদিগের মধ্যে সম্বন্ধ যেরূপ শিক্ষকের সহিত ছাত্রের সম্বন্ধও সেইরূপ। শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের অন্তরে যদি বিশ্বাস, বিনয়নম্র আনুগত্য ও শ্রদ্ধা না থাকে তাহা হইলে ছাত্রের কোন প্রকার চিত্তোন্নতি হইতে পারে না।

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্

যে সকল দেশে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ নাই, সেই সকল দেশে শিক্ষক কেবল বক্তা এবং ছাত্র শ্রোতামাত্র। শিক্ষক তাঁহার প্রাপ্য পাঁচ ডলার চাহেন; আর ছাত্র চাহে যে, শিক্ষকের কথায় তাহার মগজ ভর্ত্তি হউক। এইটুকু হইলেই উভয়ের কাজ সমাধা হইয়া গেল। তারপর যে যাহার পথে চলিয়া যায়।

গুরুকে দেবতাজ্ঞানে পূজা কর, কিন্তু তাঁহাকে অন্ধের মত অনুসরণ করিও না। তাঁহাকে মন্দিরের পাষাণমূর্ত্তিতে পরিণত

করিও না। তাঁহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাস, ভক্তি কর। কিন্তু স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে ভুলিও না।

ছাত্রের প্রবৃত্তিকে সদভিমুখী করিবার জন্য শিক্ষককে অবশ্যই সমস্ত শক্তির প্রয়োগ করিতে হইবে। গভীর স্নেহ ও সহানু-ভূতির অভাব থাকিলে আমরা কখনও উত্তম শিক্ষা দিতে পারি না। কোন মানুষের বিশ্বাস বিচলিত করিতে চেষ্টিত হইও না। যদি পার তাহা হইলে তাহাকে মহত্তর কিছু দাও; কিন্তু তাহার যাহা আছে তাহা নষ্ট করিও না। বড় কিছু না দিতে পারিলে তাহার যাহা সম্বল আছে তাহা নষ্ট করা উচিত নয়।

শিক্ষার্থীর প্রতি সহানুভূতি

তিনিই প্রকৃত শিক্ষক যিনি নিজেকে ছাত্রদের মধ্যে মুহূর্ত্তের মধ্যে সহস্রধা করিতে পারেন। আকাশের এক চন্দ্র যেমন নদীর সহস্র তরঙ্গে সহস্র বিম্বিতরূপে প্রতিফলিত হয়—শিক্ষককেও ছাত্রদের মধ্যে তেমনি ভাবে বিম্বিত হইতে হইবে। তিনিই প্রকৃত শিক্ষক যিনি একেবারে ছাত্রদের স্তরে নামিয়া আসিতে পারেন এবং নিজের আত্মাকে ছাত্রের আত্মায় একীভূত করিয়া তাহারই মানস দৃষ্টি দিয়া সব কিছু দেখেন এবং উপলব্ধি করেন। এইরূপ শিক্ষকই প্রকৃত শিক্ষাদানে সমর্থ, অন্যে নহে। অতএব শিক্ষক নির্বাচনও একটি মস্তবড় সমস্যা।

চরিত্র গঠনের শিক্ষা

স্বামীজি এই অংশে চরিত্রগঠনকে শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এই চরিত্রগঠনে চিন্তাশক্তির মূল্য, সুখদুঃখের ক্রিয়া ও তাহার ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন কেবল চরিত্র নয়। আমাদের অদৃষ্টের নির্মাতাও আমরা নিজে। চরিত্র-গঠনের প্রধান বাধা অজ্ঞতা। চরিত্রগঠন করিতে হইলে অসৎ অভ্যাস বর্জ্জন ও সৎ অভ্যাস অর্জ্জন করিতে হইবে।

পাঁচ

চরিত্র-গঠনের শিক্ষা

প্রত্যেক মানুষের চরিত্র তাহার মানসিক প্রবৃত্তিসমূহের সমষ্টি—তাহার মনের গতিপ্রকৃতির সমবায় মাত্র। সুখদুঃখ যখন আত্মার উপর দিয়া যাতায়াত করে, তখন উহারা আত্মাতে ছায়াপাত করিয়া চলিয়া যায়। এই সকল ছায়াপাতের একত্রীভূত ফলকে আমরা মানবচরিত্র বলিয়া থাকি। আমাদিগের চিন্তাপরম্পরা আমাদিগকে যে ভাবে গঠন করে আমরা তাহাই। আমাদের দৈহিক সত্তা যেন একএকটি লৌহপিণ্ড। প্রত্যেক চিন্তা ঐ লৌহপিণ্ডে এক একটী হাতুড়ির

চিন্তাশক্তির মূল্য

আঘাতের মত। আমরা যাহা হইতে বাসনা করি, তাহাই ইহা সৃষ্টি করে। বাক্যসমূহ গৌণ, চিন্তাসমূহই মুখ্য। বাক্য স্থায়ী হয় না। চিন্তারাশি প্রাণবন্ত হইয়া স্থায়িত্ব লাভ করে এবং দূরদূরান্তরে গমনাগমন করে। সুতরাং এই চিন্তা সম্বন্ধে সাবধান হও।

চরিত্রগঠনে সুখ দুঃখের ক্রিয়া

চরিত্রগঠনে শুভ ও অশুভ উভয়বিধ উপাদানের সমান অংশ থাকে। সুখ ও দুখ দুইই আমাদের শিক্ষক। কতকগুলি ক্ষেত্রে সুখ অপেক্ষা দুঃখই মহত্তর শিক্ষক। জগতে যে সকল মহৎ চরিত্রের আবির্ভাব হইয়াছে সেইগুলি লইয়া আলোচনা করিলে স্বচ্ছন্দে বলিতে পারা যায় যে, বহু ক্ষেত্রে দেখাও যায়, দুঃখই সুখ অপেক্ষা অধিকতর শিক্ষা দেয়; দারিদ্র্য, সম্পদ্ অপেক্ষা অধিক শিক্ষা দেয়, স্তুতিবাদ অপেক্ষা আঘাতই অন্তরের অগ্নি অধিকতর সন্ধুক্ষিত করে। বিলাসের ক্রোড়ে লালিত পালিত ও কুসুমাস্তীর্ণ শয্যায় শায়িত হইয়া এবং জীবনে কখনও একবিন্দু অশ্রুপাত না করিয়া কে কবে বড় হইয়াছে? অন্তর যখন বিচলিত হয়, চতুর্দ্দিকে যখন দুঃখের ঝড় বহিতে থাকে, যখন জীবন-পথের সকল আলোক একে একে নিভিয়া যায়, মনে হয় সে আলোক বুঝি আর দেখিবে না, যখন সকল আশাভরসা ছিন্নপ্রায় হয়, তখনই সেই আধ্যাত্মিক ঝঞ্ঝার

মধ্যেই অন্তরের আলোক নিবিড় অন্ধকার ভেদ করিয়া জ্বলিতে আরম্ভ করে।

হ্রদের সহিত মনের উপমা দিয়া বলা যায়, হ্রদের মত মনের মধ্যে হিল্লোল উঠে, কল্লোলও উঠে। তাহারা ক্রমে বিলীন হয়—কিন্তু তাহা একেবারে নিশ্চিহ্নরূপে বিলুপ্ত হয় না, মনে হয় যেন একেবারে বিলীন হইল। পরন্তু ইহারা এক প্রকটি দাগ রাখিয়া যায় এবং ভবিষ্যতে ঐ দাগের পুনঃপ্রকাশের সম্ভাবনাও থাকে। আমাদের প্রত্যেক কাজ, দেহের প্রতিটি সঞ্চালন, মনের প্রতিটি চিন্তা, মানসিক উপাদানে এইরূপ এক একটি ছাপ রাখিয়া যায়। যদিও বহির্দেশে এই ছাপগুলি স্পষ্ট লক্ষিত হয় না, তথাপি উহারা অবচেতন স্তরে, মনের নিম্নদেশে থাকিয়া প্রবলভাবে কাজ করিতে থাকে। মনের উপর এই সকল ছাপ, যাহাকে দর্শনের ভাষায় বলে সংস্কার, সেই সংস্কারগুলির সমষ্টি দ্বারাই নিরূপিত হয় প্রতি মুহূর্তে আমরা কি রূপ ধারণ করিব।

ক্রিয়ার ফলাফল

এই সকল সংস্কারের সমবায়ের দ্বারাই প্রত্যেক মানবের চরিত্র সংগঠিত হয়। যদি সৎ সংস্কার সমূহ প্রাধান্য লাভ করে তাহা হইলে চরিত্র সৎ হয়। যদি আমরা অনবরত অসৎ কথা শ্রবণ করি, অসৎ চিন্তার প্রশ্রয় দিই, অসৎ কর্ম্ম করি, আমাদের মন অসৎ সংস্কারে পূর্ণ হইবে। ঐ অসৎ সংস্কারগুলি

আমাদের প্রত্যেক চিন্তা ও কার্য্যকে প্রভাবিত করিবে। আমরা জানিতেও পারিব না কিরূপে তাহারা মনের গোপন কক্ষে কাজ করিতেছে। বাস্তবিক পক্ষে, এই অসৎ সংস্কারগুলি কখনও নিষ্ক্রিয় থাকে না, তাহারা সর্বদা ক্রিয়াশীল। এই সকল সংস্কারের সমষ্টি অসৎ কর্মসম্পাদনের জন্য এক প্রবল ইচ্ছা-শক্তি উৎপন্ন করে। এই সংস্কারপুঞ্জ আমাদিগকে এমনই বশীভূত করিয়া ফেলে যে আমরা হইয়া পড়ি যন্ত্রবৎ —আমাদের ব্যক্তিত্ব তাহাদের দাসত্ব করিতে থাকে।

সেইরূপ যদি কেহ সৎ চিন্তা মনে পোষণ করে ও সৎ কর্ম করে তাহার সংস্কার-সমষ্টি হইবে সৎ এবং ঠিক সমভাবেই উহারা তাহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাকে সৎ কর্মে প্রণোদিত করিবে। যে ব্যক্তি জীবনে অনেক সৎচিন্তা করিয়াছে, সৎকর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছে স্বভাবতই তাহার মনে যাহা কিছু সৎ তাহার দিকেই একটা অনিবার্য্য অদম্য প্রবৃত্তি জন্মিবে। তখন সে মন্দ কাজ করিতে ইচ্ছা করিলেও তাহার সৎপ্রবৃত্তির দ্বারা গঠিত মন তাহাকে উক্ত কাজ করিতে দিবে না। সে তখন সম্পূর্ণভাবে সৎপ্রবৃত্তির প্রভাবাধীন। যখন মানুষ এইরূপ অবস্থায় উপনীত হয় তখন তাহার সৎ চরিত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

চরিত্র-গঠন

তোমরা যদি প্রকৃতপক্ষে কাহারো চরিত্র বিচার করিতে

চাও, তাহার বড় বড় কাজগুলির প্রতি লক্ষ্য করিও না। তাহার অতি সামান্য তুচ্ছ কাজগুলির দিকে দৃষ্টিপাত কর। মহৎ ব্যক্তির প্রকৃত চরিত্র জানিতে হইলে তাহার ছোট ছোট কাজগুলির হিসাব রাখিও। বৃহৎ অনুষ্ঠানসমূহ হীনমনা মানুষকেও অনেক সময় মহত্ত্বের প্রকাশে উদ্দীপিত করে। সাময়িক উত্তেজনার বশেও অতি অসৎ লোকও খুব একটা বড় কাজ করিয়া ফেলে—তাহা তাহার আসল চরিত্রের অভিব্যক্তি নয়। কিন্তু তিনিই প্রকৃত মহাপুরুষ যাঁহার চরিত্র সর্বাবস্থায় সর্ব্বক্ষেত্রে উন্নত ও উদার। যেখানেই তিনি থাকুন না, যে অবস্থায় তিনি পড়ুন না কেন, তাঁহার মহৎ চরিত্র অপরিবর্তনীয় থাকে।

যখন এইরূপ মুদ্রাঙ্ক অধিক সংখ্যায় মনের উপর পতিত হয়, তখন উহারা একত্রে মিলিত হইয়া অভ্যাসে পরিণত হয়।

সৎ ও অসৎ অভ্যাস

একটি ইংরাজী প্রবাদ আছে, অভ্যাসই দ্বিতীয়া প্রকৃতি। অভ্যাস প্রথমা প্রকৃতিও বটে এবং ইহাই মানবের সমগ্র প্রকৃতি।* আমাদের সব কিছুই অভ্যাসের ফল। এই সত্য আমাদিগকে এক

---

* কর্ম্মফলবাদ ও পুনর্জন্মবাদের ভিত্তিতে এই তথ্য প্রতিষ্ঠিত। জন্মের সময় হইতেই চরিত্রগঠনের সূত্রপাত হয়—প্রাক্তন জন্মের অভ্যাসই চরিত্রগঠনের প্রাথমিক স্তর প্রস্তুত করে।

হিসাবে আশ্বস্ত করে। কারণ, যখন কেবলমাত্র অভ্যাসই আমাদের সকল ভালো বা মন্দের মূলে তখন যে কোন সময়ে আমরা উহা ভাঙ্গিতে বা গড়িতে পারি। আমাদের চরিত্র যখন বহিঃপ্রকৃতির উপর নির্ভর করে না—তখন এ বিষয়ে আমাদের স্বাধীনতা আছে। ইহা কি অল্প আশ্বাসের কথা? অসৎ অভ্যাসের একমাত্র প্রতিকার বিপরীত অভ্যাস। সকল কদভ্যাস অনুরূপ সদভ্যাস দ্বারা দমিত ও দলিত হইতে পারে। অবিরত সৎকর্ম ও সৎ চিন্তা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে করিয়া যাও। নীচ প্রবৃত্তি দমনের উহাই একমাত্র উপায়। কাহাকেও বলিও না—'তোমার আশা নাই।' কারণ, সেত কেবলমাত্র চরিত্রের অভিব্যক্তি, সে চরিত্র কতকগুলি অভ্যাসের সমষ্টি বই আর কিছুই নয়। তাহাকে নবতর ও উচ্চতর অভ্যাস দ্বারা অনায়াসে বা অল্পায়াসে রূপান্তরিত করা যায়। পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠিত অভ্যাসের দ্বারাই চরিত্রের সংস্কার হয়।

আমাদের অদৃষ্টের নির্মাতা আমরাই

যাহা কিছু অশুভ বা অনিষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহাদের মূল আমাদের মধ্যেই নিহিত। ইহার জন্য কোন অলৌকিক সত্তার উপর দোষারোপ করিও না। কখনও হতাশ বা হতোদ্যম হইও না। কখনো ভাবিও না, অন্য কেহ আসিয়া তোমাকে সাহায্য না করিলে তুমি যেখানে আছ সেখান হইতে সরিয়া যাইতে

পারিবে না। গুটিপোকা যেমন নিজেদের ভিতর হইতে তন্তর সৃষ্টি করিয়া গুটি তৈরী করে এবং ঐ গুটির মধ্যে নিজে আবদ্ধ হইয়া পড়ে, আমরাও তেমনি স্বীয় অন্তঃসত্তা হইতে তন্তু তৈয়ারী করিয়া গুটি বয়ন করি। কালক্রমে স্বনির্মিত গুটির মধ্যেই আমরাও নিজেদের আবদ্ধ করিয়া ফেলি—কর্ম্মজালই এই গুটি। আমরাই আমাদের চতুর্দিকে এই দুর্ভেদ্য কর্মজাল বয়ন করিয়াছি। এবং অজ্ঞানবশতঃ আমরা ভাবি, স্বকর্মজালে আমরা আবদ্ধ। তখন ভয় পাইয়া আমরা ক্রন্দন করি ও অন্যের সাহায্যের জন্য বিলাপ করি। কিন্তু আমরা ভুলিয়া যাই যে আসল সাহায্য বাহির হইতে আসে না। ইহা আমাদের অন্তর হইতেই আসে।

জগতের সকল দেবতার বেদীতে মাথা খুঁড়িয়া মর, তাহাতে ফল হইবে না। বহু বৎসর আমিও ঐরূপ ক্রন্দন করিয়াছি। অবশেষে দেখিলাম আমি সাহায্য পাইয়াছি। কিন্তু সে সাহায্য আসিয়াছে বাহির হইতে নয়, অন্তর হইতে। ভ্রমবশতঃ আমি যাহা করিয়াছিলাম তাহা সংশোধন করিতে হইল। আমরা নিজের চারিদিকে যে জাল বয়ন করিয়াছিলাম তাহা আমাকে ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইয়াছে। জীবনে আমি বহু ভুল করিয়াছি। কিন্তু মনে রাখিও, ঐ সকল ভুল না করিলে আমি আজ যাহা হইয়াছি তাহা হইতে পারিতাম না। আমি একথা বলিতেছি না

যে, তোমাদের গৃহে ফিরিয়া গিয়া ইচ্ছা করিয়া ভুল করিতে হইবে। এইভাবে আমায় ভুল বুঝিও না। কিন্তু ভুল করিয়াছ বলিয়া দুঃখে ম্রিয়মাণ হইও না।

আমরা দুর্বল বলিয়াই ভুল করিয়া বসি এবং আমরা অজ্ঞ বলিয়াই দুর্বল। অতএব অজ্ঞতা হইতেই ভুলের সৃষ্টি। কে আমাদিগকে দুর্বল করিয়াছে? আমরা নিজেরাই। আমরা চক্ষুতে হাত চাপা দিয়া অন্ধকারের সৃষ্টি করিয়া কাঁদিতে থাকি! চক্ষু হইতে হাত সরাইয়া লও, আলোক দেখিবে। মানবাত্মার স্বয়ংভাস্বর প্রকৃতির মধ্যেই আলোক রহিয়াছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ কি বলেন তাহা শোন নাই? এই বিবর্তনের কারণ কি? বাসনা। পশুও কিছু করিতে চায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার পারি-পার্শ্বিক অবস্থা ও তাহার পরিবেষ্টনী অনুকূল নহে। সেইজন্যই সে উচ্চতর স্তরের নূতন দেহ ধারণ করে। কে ঐ নব দেহ সৃষ্টি করে? পশু নিজেই, তাহার ইচ্ছাশক্তিই।

অজ্ঞতাবশতই ভুল হয়

তোমরা ইচ্ছাশক্তির অনুশীলন করিয়া যাও। ইহা তোমাকে উচ্চতা স্তরে লইয়া যাইবে। ইচ্ছাই সর্বশক্তিময়ী। তোমরা বলিতে পার, ইহা যদি সর্বশক্তিময়ী তাহা হইলে আমি কেন সব কিছু করিতে পারি না? না পারার কারণ তোমরা কেবল তোমাদের ক্ষুদ্র সত্তার বিষয় চিন্তা করিতেছ। ক্ষুদ্রতম

জীবনাঙ্কুর হইতে মানবশরীর পর্য্যন্ত তোমার স্তরে স্তরে বিবর্ত্তিত অবস্থার দিকে তাকাও। এ সকল কে করিয়াছে? তোমার নিজের ইচ্ছাশক্তি। ইচ্ছা যে সর্বশক্তিময়ী তাহা কি অস্বীকার করিতে পার? যাহা তোমাকে এত উচ্চে তুলিতে পারিয়াছে তাহা তোমাকে আরও উচ্চে তুলিতে পারে। যাহা তোমাকে এতদূর আগাইয়া আনিয়াছে বাকিপথ সেই তোমাকে লইয়া যাইবে। তোমার কর্তব্য চরিত্রগঠন, ইচ্ছাশক্তির ক্রমবিকাশ ও পুষ্টিসাধন।

চরিত্র গঠন কর

কয়েকটী ভ্রান্ত পদক্ষেপের জন্য তোমার অগ্রগতিতে বাধা পড়িয়াছে। তাই বলিয়া যদি তুমি গৃহে ফিরিয়া শোকবেশ ধারণ করিয়া সারা জীবন কাঁদিয়া কাটাও তাহাতে তোমার কোন লাভ হইবে না। পরন্তু, ইহা তোমাকে আরও অধিকতর দুর্বল করিবে। এই গৃহটি যদি হাজার বৎসরের অন্ধকারে পূর্ণ হইয়া থাকে এবং তুমি ভিতরে বসিয়া কেবল বিলাপ করিতে থাক তাহা হইলে এ অন্ধকার কি দূরীভূত হইবে? বাতি জ্বাল। মুহূর্ত মধ্যেই আলোক আসিবে।

'হায়! আমি বহু পাপ করেছি; অনেক ভুল করেছি' বলিয়া যদি সারা জীবন অনুতাপ করিতে থাক তাহার দ্বারা তোমার কি লাভ হইবে? উক্ত সত্য প্রকাশের জন্য কোন দেবতা বা উপদেবতার প্রয়োজন হইবে না। দিব্য আলোক প্রজ্বলিত কর।

মুহূর্ত্তের মধ্যে সকল মন্দ দূরীভূত হইবে। চরিত্র গঠন কর। তোমার আসল স্বরূপ প্রকাশ কর। তোমার আসল স্বরূপ জ্যোতির্ময়, দীপ্তিশালী ও চিরনির্মল। ঐ স্বরূপকে প্রকট কর এবং যাহাকেই দেখিতে পাও, তাহার মধ্যে উক্ত স্বরূপকে উদ্বোধিত কর।

ধর্ম্মশিক্ষা

এই অংশের আলোচ্য বিষয়, সাধুসন্তগণের প্রতি ভক্তিনিবেদনের সার্থকতা, সেবার আদর্শ, বীর্য্যমূলক বীরধর্ম্মের উদ্বোধন, সত্যনিষ্ঠতা ও নির্ভীকতার অনুশীলন, উপনিষদের আদর্শে আত্মোৎকর্ষসাধন, ধর্ম্মান্ধতাবর্জ্জন ও হৃদয়বৃত্তির অনুশীলন। সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবই বর্ত্তমান যুগের প্রকৃত ধর্ম্মগুরু।

ছয়

ধর্মশিক্ষা

ধর্মই শিক্ষার অন্তরতম মর্মস্থল। ধর্ম সম্বন্ধে আমার বা অন্য কাহারো মতের কথা বলিতেছি না। ধর্মের যে নীতিসূত্রগুলি যুগে যুগে দেশে দেশে শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছে, লোকসমক্ষে সেই যথার্থ সনাতন নীতিসূত্রসমূহ উপস্থাপিত করা আবশ্যক।

সাধুসন্তদের প্রতি ভক্তি নিবেদন

সর্ব প্রথমে আমাদিগকে সমাজে মহাপুরুষগণের পূজা প্রবর্তন করিতে হইবে। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, মহাবীর (হনুমান), শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি মহাত্মাদিগকে অনুসরণযোগ্য আদর্শরূপে লোকসমক্ষে উপস্থাপিত করিতে হইবে। ইঁহারা শাশ্বত সত্যের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছেন এবং প্রচার করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা এখন থাকুক। যে শ্রীকৃষ্ণ সিংহগর্জ্জনে গীতার বাণী ঘোষণা করিয়াছিলেন তাঁহার পূজা দূরদূরান্তরে প্রচার কর।

সকল শক্তির উৎস জগজ্জননী মহাশক্তির নিত্য আরাধনা প্রবর্ত্তন কর। যে বীরের দৃষ্টান্তের প্রভাবে আপাদমস্তক সকল ধমনী-শিরার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে প্রচণ্ড রজঃশক্তির তড়িৎ

প্রবাহের সঞ্চার হয় আমরা বর্তমানে সেই বীরের আদর্শ সর্বাপেক্ষা বেশী চাই। এখন আমরা সেই বীরপুরুষ চাই, যিনি সত্য উপলব্ধির জন্য জীবন উৎসর্গ করিতেও সাহসী হইবেন। এখন সেই বীরের আবশ্যক, ত্যাগ যাঁহার ধর্ম এবং জ্ঞান যাঁহার অসি। যুদ্ধক্ষেত্রে সাহসী সৈনিকের যে বীরভাব, আমরা সেই বীরভাবই চাই।

সেবার আদর্শ

মহাবীরের চরিত্রকে তোমাদের আদর্শ কর। রামচন্দ্রের আদেশে তিনি সমুদ্রপারে গিয়াছিলেন, তিনি মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়াছিলেন, তিনি সম্যক্‌রূপে ইন্দ্রিয়জয়ী এবং অসাধারণ বিচক্ষণ ছিলেন। ব্যক্তিগত সেবার এই আদর্শে জীবন গঠন কর। উক্ত আদর্শের মধ্য দিয়া অন্যান্য ভাবসমূহ জীবনে ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইবে। বিনা প্রশ্নে গুরুর আনুগত্য ও কঠোর ব্রহ্মচর্য্যপালনই ধর্মজীবনে সাফল্য-লাভের কৌশল। হনুমান যেমন একদিকে সেবার আদর্শ দেখাইয়াছেন, তেমনি অন্য দিকে আবার সিংহতুল্য সাহস প্রদর্শন দ্বারা জগৎকে বিস্ময়াভিভূত করিয়াছেন। শ্রীরামের সেবার্থে নিজ জীবন বিসর্জন দিতে তিনি বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই। শ্রীরামের সেবা ব্যতীত অন্য সব কার্য্যে তাঁহার ছিল অসীম ঔদাসীন্য। শ্রীরামের আজ্ঞাপালনই তাঁহার জীবনের মুখ্য ব্রত ছিল। সর্বান্তঃকরণে এইরূপ ভক্তিই আবশ্যক।

বর্তমানকালে গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের দিব্য লীলার উপাসনার প্রয়োজন নাই। বংশীবাদন বা ঐরূপ লীলাবিলাসে দেশের পুনর্জাগরণ হইবে না। খোল করতাল বাজাইয়া সংকীর্তনে মাতিয়া উদ্দাম নর্ত্তনের ফলে সমগ্র জাতি ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

চাই রণশঙ্খে গম্ভীর ধ্বনি

যে সর্ব্বোচ্চ সাত্বিক সাধনার জন্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন সর্ব্বাঙ্গীণ শুচিতা তাহাকে অবহেলা করিয়া ঐ সাধনার অনুকরণ করিতে গিয়া তাহারা তামসিকতার ঘোর পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়াছে। দেশে কি ঢাক ঢোল তৈয়ারী হয় না? ভারতে কি তূরী ভেরী মেলে না? বালকবালিকাদিগকে এই সকল বাদ্যযন্ত্রের গভীর নিনাদ শোনাও। বাল্যকাল হইতে মৃদুমধুর নারীসুলভ বাদ্যাদি শ্রবণ করিয়া দেশ আজ প্রায় নারীর দেশে পরিণত হইয়াছে।

ডমরু ও শিঙ্গা বাজাইতে হইবে; এবং মুখে 'মহাবীর', 'মহাবীর' আর কণ্ঠে 'হর, হর, ব্যোম, ব্যোম', উচ্চারণ দ্বারা দিগ্‌দিগন্ত প্রকম্পিত করিতে হইবে। যে সঙ্গীত মানবহৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলি জাগরিত করে, তাহা কিছুকালের জন্য স্থগিত রাখা দরকার। ঠুংরী নয়, কীর্ত্তন নয়, জনসাধারণকে ধ্রুপদ গান শুনিতে অভ্যস্ত করানো আবশ্যক।

পবিত্র বেদমন্ত্রের বজ্রনির্ঘোষের দ্বারা এই নিস্তেজ নির্জীব দেশে পুনরায় জীবন সঞ্চার করিতে হইবে। বীর

মানবতার কঠোর ভাব প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রবর্তন কর। যদি তোমরা এইভাবে চরিত্র গঠন করিতে পার তাহা হইলে হাজার হাজার লোক তোমাদের অনুসরণ করিবে। কিন্তু সাবধান! এক চুলও আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইও না, কখনও হতাশ হইও না। আহারে, শয়নে, স্বপনে, বেশভূষাধারণে, অথবা সেবায়, রোগে অথবা ভোগে সর্বদা সর্বোচ্চ সৎসাহস প্রদর্শন করিবে। দুর্বলতা কখনও যেন তোমার মনকে অভিভূত না করে। মহাবীরকে স্মরণ করিও। দেখিবে, তোমার সকল দুর্বলতা, সকল ভীরুতা তৎক্ষণাৎ কোথায় অন্তর্হিত হইবে।

প্রাচীন ধর্মমতে, যে ভগবানে বিশ্বাস করে না সে নাস্তিক। নূতন ধর্মমত বলে, যে আত্মবিশ্বাসী নয় সে-ই নাস্তিক। কিন্তু এই আত্মবিশ্বাস স্বার্থপ্রণোদিত হইলে চলিবে না। ইহার অর্থ সকলের প্রতি বিশ্বাস। কারণ, তোমার আত্মাই সর্বভূতে। আত্মপ্রীতির ব্যাপক অর্থ বিশ্বপ্রীতি, জীবপ্রীতি, সর্বপ্রাণীর প্রতি প্রীতি। আত্মারূপে তোমরা সকলে এক। এই মহান্ বিশ্বাস জগৎকে উন্নত করিবে। আত্মবিশ্বাস হইতেই সকল প্রেরণা ও শক্তি সঞ্চারিত হয়। যদি আত্মবিশ্বাসে আমরা আরও ব্যাপকভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত ও অভ্যস্ত হইতাম আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি যে, আমাদের বর্তমান দুঃখকষ্টের অধিকাংশ অপসারিত হইত। সমগ্র ইতিহাসে

নবধর্ম

মহামানবদিগের জীবনে যদি কোন প্রবর্ত্তিকা শক্তি একান্ত প্রবল হইয়া থাকে তবে তাহা তাঁহাদিগের অদ্ভূত আত্মবিশ্বাস। মহত্বলাভের দৃঢ় সংকল্প তাঁহাদের আজন্মসিদ্ধ ছিল বলিয়া তাঁহারা মহান্ হইতে পারিয়াছিলেন।

অসীম শক্তির অধিকারই ধর্ম। শক্তিমত্তাই পুণ্য, দুর্বলতাই পাপ। 'দুর্বলতা' এই একটি পদের মধ্যেই সমূহ পাপ ও মন্দ নি[illegible]ত আছে। সকল দুষ্কর্মের ফলই দুর্বলতা। দুর্বলতাই সর্বপ্রকার স্বার্থপরতার মূল। দুর্বলতাবশেই মানব অপরের ক্ষতি করিয়া বসে। তাহারা তাহাদের আত্মস্বরূপ জ্ঞাত হউক, দিনরাত তাহারা কেবল আবৃত্তি করুক 'সাঽহম্, সোঽহম্'। মাতৃস্তন্যপান করিবার সঙ্গে সঙ্গেই 'আমিই সেই, সোঽহম্ এই শক্তিপ্রদ মন্ত্র তাহারা শিক্ষা করুক। প্রথমে শ্রবণ, পরে চিন্তা। এই চিন্তার ফলে,জগতে অভূতপূর্ব কাজ হইবে। নির্ভয়ে সত্য কথা বল। সত্য সনাতন। সত্যই আত্মার স্বরূপ। এইরূপে সত্যের পরীক্ষা করিতে

সত্যনিষ্ঠতা

হয়—যাহা তোমাকে দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাপারে দুর্বল করে তাহা বিষবৎ ত্যাগ কর। আত্মা যাহাতে দুর্ব্বল হয়, দেহ যাহাতে অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং মনের বল যাহা হরণ করে—তাহাই অসত্য। ইহা সর্ব্বপ্রযত্নে বর্জ্জনীয়। ইহাতে জীবনীশক্তি নাই। একমাত্র সত্যই শক্তিসঞ্চার করে, আমাদের চিত্তকে আলোকিত করে,

কর্ম্মে প্রেরণা ও উৎসাহ দান করে। সত্যই পবিত্রতা, সত্যই জ্ঞান। আবার উপনিষদকে আশ্রয় কর। উপনিষদই শক্তি-সঞ্চারক চিরভাস্বর দর্শনশাস্ত্র। উহাকেই অবলম্বন কর। মহান্ সত্য, তোমার আপন অস্তিত্বের মতই সরল, তাহার মধ্যে কোন জটিলতা নাই। উপনিষদের সত্যসমূহ তোমাদের সম্মুখে বিদ্যমান। এইগুলি আয়ত্ত কর। উহার অনুশাসন অনুসারে চরিত্র গঠন কর, তাহা হইলেই ভারতের মুক্তি সহজসাধ্য হইবে।

দৈহিক শক্তি

আমাদের অন্ততঃ তিন ভাগের একভাগ দুঃখকষ্টের কারণ দৈহিক দুর্বলতা। আমরা কর্মকুণ্ঠ। আমাদের ঐক্যবদ্ধ হইবার ক্ষমতা নাই। তোতাপাখীর মত আমরা বুলি আওড়াই, কিন্তু তদনুযায়ী কাজ করি না। কেবল বক্ বক্ করা ও কাজ না করা আমাদের স্বভাবে পরিণত হইয়াছে। ইহার কারণ দৈহিক দুর্বলতা। আমাদের মস্তিষ্ক বড় দুর্বল। এইরূপ দুর্বল মস্তিষ্ক কোন কাজই করিতে পারে না। মস্তিষ্ককে সবল করিতেই হইবে। প্রথমে আমাদের যুবকদের বলবান্ হইতে হইবে, দৈহিক বল হইতে ধর্ম্মবল আপনা হইতেই আসিবে।

হে আমার তরুণ বন্ধুগণ! বীর্যবান্ হও। ইহাই তোমাদের প্রতি আমার প্রথম বাণী। গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমরা দিব্যলোকের অধিকতর নিকটবর্তী হইবে। তোমাদের

পেশীগুলি কতকটা সবল হইলে তৎসাহায্যে তোমরা গীতার মর্ম অধিক বুঝিতে পারিবে। তোমাদের রক্ত একটু সতেজ হইলে তোমরা শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব প্রতিভা ও অসামান্য শক্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইবে। গীতা যে কর্ম্মযোগে উদ্দীপনা দান করিতেছে—তাহা দুর্বলের জন্য নয়। নিজেকে যখন মানুষ বলিয়া মনে হইবে ও দুই পায়ে ভর দিয়া দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইতে পারিবে, তখনই উপনিষদের অর্থ ও আত্মার মাহাত্ম্য যথার্থভাবে উপলব্ধি করিবে।

নির্ভীকতা

বীর্য্য, বীর্য্যই উপনিষদের বাণী! উক্ত বাণীই ইহার পত্রে পত্রে ঘোষিত হইতেছে। 'অভীঃ, 'অভীঃ' এই পদটী জগতের এই একমাত্র পুস্তকে পুনঃপুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে। আর কোন শাস্ত্রে ঈশ্বর বা মানুষের সম্বন্ধে এই পদটী প্রযুক্ত হয় নাই। পাশ্চাত্যদেশের দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ আলেকজাণ্ডারের কথা আমার মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিতেছে। আমি যেন দেখিতেছি—ঐ মহান্ সম্রাট্ সিন্ধুনদীর তীরে দাঁড়াইয়া বনবাসী কৌপীনমাত্রসম্বল, এক সন্ন্যাসীর সহিত আলাপ করিতেছেন। যে মহাস্থবিরের সহিত তিনি কথা বলিতে- ছিলেন, তিনি নগ্নদেহ ও হয়ত বা সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া একখণ্ড প্রস্তরের উপর উপবিষ্ট এবং সম্রাট্ তাঁহার জ্ঞানের গভীরতায় বিমোহিত ও স্তম্ভিত হইয়া তাঁহাকে গ্রীসে লইয়া যাইবার জন্য

প্রচুর অর্থ ও সম্মানের প্রলোভন দেখাইতেছেন। আর সন্ন্যাসী উপেক্ষার হাসি হাসিয়া সম্রাটের বৈভব ও সম্মানকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া উহা প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। তখন সম্রাট অনুরোধ বা প্রার্থনার সুর বদলাইয়া নিজ মূর্ত্তি ধরিলেন এবং প্রভুত্বব্যঞ্জক কণ্ঠে বলিলেন—'যদি তুমি না আস, আমি তোমাকে হত্যা করিব।'

ইহা শুনিয়া সন্ন্যাসী অট্টহাস্য করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "এই মুহূর্ত্তে তুমি যে মিথ্যা বলিলে এমন মিথ্যা তুমি জীবনে কখনও তুমি বল নাই। কে আমাকে হত্যা করিতে পারে? তুমি কি জান না আমি এই দেহমাত্র নই? আমি জন্ম-মৃত্যু-বিরহিত আত্মা।"

ইহাই বীর্য্য! ইহাই অভীঃ!

আমাদের বলহরণ করিবার জন্য হাজার হাজার মানুষ আছে। গল্পকাহিনীও আমরা অনেক শুনিয়াছি। অতএব বন্ধুগণ,

উপনিষদই জ্ঞানের খনি

তোমাদেরই মত একজন, তোমাদেরই সজাতি একজন, তোমাদেরই মত জীবনমৃত্যুর অধীন হইয়াও আমি বলিতেছি যে, আমরা বীর্য্য চাই, বীর্যই আমাদের একমাত্র কাম্য। উপনিষদগুলিই বীর্যের মহা-ভাণ্ডার। উহাতে এত প্রচুর বীর্য্যবত্তা নিহিত আছে যে সমগ্র জগৎ তাহাতে অনুপ্রাণিত হইতে পারে। উহাদিগের সাহায্যে সমগ্র পৃথিবী শক্তিশালী ও প্রাণশক্তিতে সঞ্জীবিত হইতে পারে।

ঐ উপনিষদ সর্ব জাতির, সব ধর্মের, সব সম্প্রদায়ের দুর্বল, দুঃখী ও পদদলিতগণকে সগৌরবে স্বাবলম্বী ও স্বাধীন হইতে আহ্বান জানাইতেছে।

সমগ্র জগৎকে আহ্বান করিয়া উপনিষদ্ বলিতেছে—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত। উপনিষদগুলির মূলসূত্রই হইল স্বাধীনতা, দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা।

কিন্তু, কোন শাস্ত্রই আমাদিগকে ধার্মিক করিতে পারে না। যদি আমরা শাস্ত্রের বাণীকে জীবনে সার্থকতা দান না করি।

ধর্মের সার্থকতা আত্মোৎকর্ষ-সাধনে

জগতের সমুদয় পুস্তক পাঠ করিলেও ধর্ম বা ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের বিন্দুমাত্র জ্ঞান না জন্মিতে পারে। সারা জীবন তর্ক বা বিচারে কাটাইলেও আমরা আত্মোপলব্ধি লাভ করিতে বা সত্যের এক বর্ণও বুদ্ধিগত করিতে পারিব না। কেবল পুস্তকের সাহায্যে কোন মানব বিদ্যাবিশারদ হইতে পারে, তাহার বেশি নয়। ধর্মের বাণী কর্মের মধ্য দিয়া জীবনের অঙ্গীভূত না হইলে কেহ ধার্মিক হইতে পারে না। কতকগুলি পুস্তকের সাহায্যে তুমি একজনকে অস্ত্রোপচারে দক্ষ চিকিৎসক করিয়া তুলিতে পার না। কোন দেশ দেখিবার কৌতূহল যদি আমার জন্মে, তুমি তাহার মানচিত্র দেখাইয়া সে কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে পার না। মানচিত্রগুলি

সম্যক্‌রূপে জ্ঞান অর্জনের জন্য আমাদিগের ঔৎসুক্য সৃষ্টি করিতে পারে। ইহার বেশি নয়। ইহা ব্যতীত তাহাদিগের অন্য কোন প্রয়োজনীয়তা নাই।

মন্দির ও গীর্জা, পুস্তক ও মূর্তি ধর্মের প্রাথমিক স্তরের উপকরণমাত্র। এইগুলি ধর্মের পাঠশালার প্রাথমিক শিক্ষার সহায়তা করে মাত্র। ধর্মশিক্ষার্থী যদি উচ্চতর স্তরে আরোহণ করিতে চায়, তবে তাহার পায়ের জোরের প্রয়োজন হয়। এগুলি ঐ পায়ের জোর কতকটা বাড়ায় মাত্র। অনেকে মনে করেন—ধর্মসম্বন্ধে তাঁহারা যখন শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া এত বিচারবিশ্লেষণ করিয়াছেন, তখন তাঁহারা নিশ্চয় ধর্মের পথে অনেক দূর আগাইয়াছেন। মনে রাখিতে হইবে মতবাদ প্রচারে, বিচারবিতর্কে বা তত্ত্ববিশ্লেষণে ধর্ম নাই; আসল ধর্ম আত্মবোধে, আত্মোৎকর্ষসাধনে ও আত্মাভিব্যক্তিতে,—পাওয়ায় নয়, হওয়ায়।

হৃদয়বৃত্তির অনুশীলন কর

জগৎসমক্ষে আমরা সর্বাপেক্ষা প্রজ্ঞাবান্ বলিয়া গণ্য হইতে পারি, কিন্তু তথাপি আমরা ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করিব না। অপর পক্ষে অতিমাত্রায় শুষ্ক বুদ্ধিবৃত্তির চর্চার ফলে ধর্মহীনতার উৎপত্তি হইয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্যতম ত্রুটি এই যে, হৃদয়কে উপেক্ষা করিয়া কেবল বুদ্ধিবৃত্তিকে শাণিত করিবার জন্য

শিক্ষাদান। ইহা মানবকে অতিমাত্রায় স্বার্থপর করিয়া তোলে। এই হৃদয়হীন শিক্ষায় মানুষ কেবল নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য যশোমান বাড়াইবার চেষ্টা করে। অন্তঃকরণ ও মস্তিষ্কের মধ্যে যখন বিরোধ হয়, তখন অন্তঃকরণকেই অনুসরণ করা উচিত। হৃদয়ই মানবকে উচ্চতর রাজ্যে লইয়া যাইতে পারে। বুদ্ধি সেখানে কখনও পোঁছিতে পারে না। বুদ্ধি যেখানে সৎকর্মে প্রেরণ দেয় না, হৃদয় সেখানে সে প্রেরণা দান । সর্বদা হৃদয়ের অনুসরণ কর। হৃদয়েই আমরা জগৎপ্রভুর বাণী শুনিতে পাই।

ধর্মান্ধতা একটি ব্যাধি মাত্র

মানবতার রাজ্যে গভীরতম ভালবাসা ধর্ম হইতেই আসিয়াছে। ধর্মগুরুগণই এই জগতে শান্তির অমৃতময়ী বাণী প্রচার করিয়াছেন। যাহা কিছু অসত্য, তাহার কটুতম কঠোরতম গঞ্জনাও ধর্মগুরুদের কণ্ঠেই উচ্চারিত হইয়াছে। প্রত্যেক ধর্ম্মেই কতকগুলি বিশিষ্ট মতবাদ থাকে, সেইগুলিকেই একমাত্র অভ্রান্ত সত্য বলিয়া প্রচার করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগে।

কোন কোন জাতির ধর্মোন্মত্ত লোক হয়ত অপরকে তাহাদের মতবাদে বিশ্বাস করাইতে তরবারির সাহায্য লয়। ইহা দুর্জ্জনতা নয়, পরন্তু ইহা মানবমনের গোঁড়ামি নামক ব্যাধিবিশেষ। তথাপি এইরূপ ধর্ম্মসংঘর্ষ ও দ্বন্দ্বের মধ্য হইতেও

জগতে মধ্যে মধ্যে উদাত্ত কণ্ঠে শান্তি ও মৈত্রীর বাণী ঘোষিত হইয়াছে।

প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়ে যে একই ভাবধারা কাজ করিতেছে, একই ভগবান যে সকল ধর্মেরই উদ্দিষ্ট, ইহা বুঝাইবার জন্য এক জন মহাপুরুষের আবির্ভাবের অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছিল। যিনি সর্বজীবে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেন, যাঁহার অন্তঃকরণ দরিদ্রের জন্য, দুর্বলের জন্য, পতিত ও সর্বহারাদিগের জন্য কাঁদে এবং সেই সঙ্গে যিনি শুধু ভারতে নহে, ভারতের বাহিরেও তাঁহার অসামান্য উজ্জ্বল বুদ্ধিশক্তির দ্বারা পরস্পরবিরোধী ধর্মমতের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করিতে পারেন, জগতে এমন একজন মহাপুরুষের আবির্ভাবের প্রয়োজন হইয়াছিল। এমন মহাপুরুষ জন্মিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে বসিবার সৌভাগ্যও আমার হইয়াছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বধর্ম-সমন্বয়ের গুরু।

আমি আমার গুরুর নিকট হইতে এই অপূর্ব সত্য শিখিয়াছি যে, জগতের ধর্মগুলি পরস্পরবিরুদ্ধ নহে। এক শাশ্বত ধর্মের সেগুলি বিভিন্ন স্তরমাত্র। শ্রীরামকৃষ্ণ কাহাকেও কখনও কটু কথা বলেন নাই। তিনি এমনই উদার পরমতসহিষ্ণু ছিলেন যে, প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই লোকে ভাবিত তিনি তাহাদেরই একজন। তিনি প্রত্যেককে ভালবাসিতেন; তাঁহার নিকট সকল

ধর্মই ছিল সত্য। সাম্প্রদায়িকতা ও মতভেদের বেড়াবেড়ী ভাঙিতেই তাঁহার সমগ্র তাপসজীবনটীই উৎসৃষ্ট হইয়াছিল।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, গ্রহণকেই আমাদের মূলমন্ত্র করিতে হয়, বর্জ্জনকে নয়। সকল ধর্ম্মমতেই যখন সত্য আছে, তখন কোনটাই বর্জ্জনীয় নয়। ধর্ম্মের ক্রম-বিবর্ত্তনের স্তরপরম্পরায় সবগুলিকে যথাযোগ্য স্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়া লইলেই হইল। কেবল সহিষ্ণুতা নয়,কারণ, তথাকথিত সহিষ্ণুতা অনেক ক্ষেত্রেই ধর্ম্মের বিরোধিতা। পরমত-সহিষ্ণুতার অর্থ এই যে আমি তোমার মতবাদ ভ্রান্ত বলিয়া জানি —তবু আমি তোমার সঙ্গে শত্রুতা করিতেছিনা।— তোমাকেও বাঁচিয়া থাকার সুযোগ দিতেছি। অপরকে বাঁচিয়া থাকিবার সুযোগ দিতেছি—এই চিন্তা কি ধর্ম্মের বিরেধিতা বা ভগবদ্‌বিধির প্রতিকূলতা নয়?

সহন নয়, গ্রহণ

অতীতের সকল ধর্মকে আমি মানি এবং তাহাদের সব-গুলিকেই শ্রদ্ধা করি। যে যেভাবেই ঈশ্বরোপাসনা করুক না কেন, আমি তাহার সহিত ঈশ্বরারাধনা করিতে পারি। এক ভগবানের উপাসনায় কাহারও সহিত বিরোধ হইতে পারে না। আমি মুসলমানদের মসজিদে যাইয়া তাহাদের সঙ্গে উপাসনা করিতে প্রস্তুত। আমি খৃষ্টানদিগের গীর্জায় যাইব ও ক্রুশের নিকট নতজানু হইব। আমি বৌদ্ধমন্দিরে যাইব এবং বুদ্ধ ও তাঁহার

ধর্মের শরণ লইব। যে আলোকে মানবহৃদয় উদ্ভাসিত হয় সেই আলোকের সন্ধান করিতেছে যে হিন্দু, তাহার সঙ্গে বনে গিয়া আমি ধ্যানমগ্ন হইতে প্রস্তুত।

আমি যে কেবল ইহাতেই ক্ষান্ত হইব তাহা নহে, পরন্তু ভবিষ্যতে যে সব মতবাদ আসিবে, সে সকলের জন্যও আমি আমার অন্তঃকরণ উন্মুক্ত রাখিব। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের কি শেষ হইয়াছে? ভগবানের প্রত্যাদেশের বিরাট গ্রন্থের কি পরিসমাপ্তি হইয়াছে ? না, এখনও অবিরাম নব নব অধ্যায়ের সমাগম হইবে? জগতের অধ্যাত্ম বিকাশ এক অপূর্ব্ব কাহিনী। বাইবেল, বেদ কোরান ও অন্যান্য ধর্মপুস্তক সে মহাগ্রন্থের কতকগুলি পৃষ্ঠামাত্র। এখনো তাহার বহুপৃষ্ঠা আমাদের নয়নসমক্ষে প্রতিভাত হইতে বাকি আছে।

নিরবচ্ছিন্ন প্রত্যাদেশ

অতীতের যাহা ছিল আসুন আমরা তাহা গ্রহণ করি, বর্তমানের এবং ভবিষ্যতের জন্য হৃদয়ের দ্বারবাতায়নগুলি উন্মুক্ত রাখি। অতীতের ধর্মগুরুগণকে প্রণাম। বর্তমানের সকল মহাত্মাকে প্রণাম এবং অনাগত যুগের সকল মহাপুরুষের উদ্দেশে আমার প্রণিপাত।

নারীগণের শিক্ষা

এই অংশে স্বামীজি বলিয়াছেন—নারীগণের প্রতি শ্রদ্ধাদানই প্রকৃত শক্তি উপাসনা। নারীজাতিকে শ্রদ্ধাদান করিতে হইলে তাহাদিগকে ধর্ম্মমূলক শিক্ষা দান করিতে হইবে। সীতার আদর্শ তাহাদের মধ্যে সঞ্চার করিতে হইবে, অপর বিদ্যাতেও তাহাদের শিক্ষা দিতে হইবে এবং আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাহাদিগকে উদ্দীপিত করিতে হইবে।

সাত

নারীগণের শিক্ষা

এই দেশে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে এত ভেদসৃষ্টি কেন করা হয় তাহা আমি বুঝিতে পারি না। অথচ এই দেশেরই বেদান্ত প্রচার করে যে, একই আত্মা সর্বভূতে বিরাজমান। স্মৃতি-গ্রন্থাদি লিখিয়া কঠিন নিয়মের অনুশাসনের ও বিধিনিষেধের নানা বন্ধনের সৃষ্টি করিয়া পুরুষগণ স্ত্রীলোকদের কেবল প্রজনন-যন্ত্রে পরিণত করিয়াছে। দেশের অধঃপতিত যুগে যাজক সম্প্রদায় যখন অন্যান্য সম্প্রদায়কে বেদপাঠে অনধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিলেন, সেই সময় নারীকেও তাঁহারা নারীত্বের সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত করিলেন। বেদ উপনিষদের যুগে দেখা যায়, মৈত্রেয়ী, গার্গী ও অন্যান্য পুণ্যশ্লোকা মহিলারা ঋষিদিগের মর্য্যাদা ও অধিকার লাভ করিয়াছেন। এই ভারতেই একদিন সহস্র বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের এক সভায় গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে বিতর্কের জন্য সাহসভরে আহ্বান করিয়াছিলেন।

নারীর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিয়া সকল জাতিই মহত্ত্ব অর্জন করিয়াছে। যে জাতি এবং যে দেশ নারীর সম্মান করে না, তাহারা কখনও মহৎ হইতে পারেই না, ভবিষ্যতেও কখনো পারিবে না। যিনি ঈশ্বরকে সর্ববব্যাপিকা শক্তিরূপে উপলব্ধি করেন, নারীর মধ্যে তিনি সেই শক্তিরই বিকাশ দেখেন।

প্রকৃত শক্তি উপাসনা

আমেরিকায় পুরুষরা নারীকে এই চক্ষেই দেখেন এবং নারীর প্রতি যথাযথ ব্যবহার করেন। সেইজন্যই তাঁহারা এত উন্নত, এত বিজ্ঞ, এত স্বাধীন ও এত উৎসাহী! শক্তির এই সকল জীবন্ত প্রতিমূর্তিদের প্রতি শ্রদ্ধার অভাবই আমাদের জাতীয় জীবনের অবনতির মূল কারণ। মনু বলেন, "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।" নারী যেখানে পূজিতা, দেবতাগণ সেখানে আনন্দ লাভ করেন এবং যেখানে নারী পূজা পায় না সেখানে সব কাজ, সব চেষ্টা নিষ্ফল হয়। যে পরিবারে বা যে দেশে নারীরা দুঃখে যাতনায় জীবনযাপন করে, সে পরিবারের বা দেশের উন্নতির কোন আশা নাই।

শিক্ষাই নারীজাতির সকল সমস্যার মীমাংসা করিবে

নারীজীবনে বহুপ্রকার গুরুতর সমস্যা আছে। কিন্তু শিক্ষা দ্বারা সমাধান হইতে পারে না এমন কোন সমস্যা নাই। মনু কি বলিয়াছেন? "পুত্রগণকেও যেরূপ যত্ন সহকারে শিক্ষা দেওয়া হয় কন্যাগণকেও সেইভাবে পালন করা ও শিক্ষা দেওয়া উচিত।" "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।" ত্রিশবৎসর বয়স পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যপালনের পর যেমন পুত্রগণের বিবাহ দিতে হয়, 'বিবাহের পূর্বে কন্যাদেরও তেমনি ব্রহ্মচর্য্যপালন ও শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা কি করিতেছি? তাহাদিগকে আমরা হীন

দাসীত্বের পরাধীনতা ও অসহায়তার আবহাওয়ায় গড়িয়া তুলিতেছি। এবং সেইজন্য সামান্য মাত্র আপদ-বিপদের আভাস্ পাইলেই তাহারা কেবল অশ্রুপাত করিতে পারে। নারীগণকে এমন অবস্থায় আনিতে হইবে, যাহাতে তাহাদের সমস্যাগুলি নিজেরাই স্বকীয় পদ্ধতিতে সমাধান করিতে পারে। জগতের সকল দেশের নারীদের মত ভারতীয় নারীদেরও এ বিষয়ে সামর্থ্য আছে।

ধর্মকে কেন্দ্র করিয়া স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে। ধর্মনিরপেক্ষ অন্য সকল শিক্ষাই গৌণ। ধর্মমূলক শিক্ষাই মুখ্য।

ধর্মই এই শিক্ষার মর্মস্থল

অতএব ধর্মশিক্ষা, চরিত্রগঠন ও ব্রহ্মচর্য্যব্রত-পালন প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। সতীত্ব কি, হিন্দুনারী তাহা স্বভাবতই বোঝে। কারণ, বংশপরম্পরায় সতীত্ববোধ তাহাদের সংস্কারে দাঁড়াইয়াছে। সর্বোপরি প্রথমে তাহাদের সহজভাবে সঞ্জাত সতীত্বের আদর্শের প্রতি তাহাদের স্বাভাবিক অনুরাগটিকে প্রবলতর করিয়া তুলিতে হইবে। তাহারা যেন এমন ভাবে দৃঢ় ভিত্তিতে চরিত্র গঠন করিতে পারে, যাহার ফলে কি বিবাহিত জীবনে, কি অবিবাহিত জীবনে জীবনের সকল ক্ষেত্রেই তাহারা মৃত্যুবরণ করিতে প্রস্তুত হইবে, তবু সতীমার্গ হইতে একতিলও বিচলিত হইবে না।

সীতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ভারতের নারীগণকে সীতার

জীবনের অনন্যসাধারণ মনোবৃত্তির অনুশীলন করিতে হইবে।

সীতাই হিন্দুনারীর আদর্শ

সীতাই ভারতীয় রমণীর উৎকৃষ্ট নিদর্শন। কারণ, ভারতীয় নারীজীবনের নির্মল পরিপূর্ণাঙ্গ আদর্শমালা ঐ এক সীতার জীবন হইতেই বিকীর্ণ হইয়াছে। এই সীতাচরিত্রই সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলের শ্রদ্ধার্ঘ্য লাভ করিয়া আসিয়াছে। এই মহীয়সী মহিমময়ী সীতাদেবী—মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা অপেক্ষাও পবিত্রতর, অশেষ দুঃখের মধ্যে সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি হইয়া চিরকাল বিরাজ করিবেন।

নীরবে বিনা প্রতিবাদে যিনি দুঃখ সহ্য করিলেন, যিনি একাধারে নারীরূপে মহীয়সী, জায়ারূপে "পতিব্রতানাং ধুরি সংস্থিতা," তিনি মানবজাতির আদর্শস্থানীয়া, আমাদের জাতীয় দেবতা। তিনি অবশ্যই চিরকাল দেশের চিত্তলোকে সগৌরবে বিরাজ করিবেন। আমাদের এই জাতির জীবনীশক্তির উৎসমূলে তাঁহার আসন। আমাদের নারীজাতিকে নব্যভাবাপন্না করিতে যাইয়া যদি সীতার আদর্শ হইতে বহুদূরে লইয়া যাওয়া হয়, তাহা হইলে তাহা নিষ্ফল হইবে। এই নিষ্ফলতা নিত্যই ত চোখে পড়িতেছে।

বর্তমান যুগের প্রয়োজন বিবেচনা করিলে কতকগুলি নারীকে ত্যাগের আদর্শে দীক্ষা দিয়া গড়িয়া তুলিতে

হইবে। যাহাতে তাহারা সারা জীবন সতীধর্ম্মের মহাশক্তিতে বলীয়সী ও ব্রহ্মচারিণী থাকিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অতি প্রাচীন কাল হইতে তাহাদের রক্তে যে সতীত্বের শক্তি নিহিত আছে, তাহাকেই প্রবুদ্ধ করিলেই চলিবে, মাতৃভূমির কল্যাণের জন্য তাঁহার কতকগুলি দুহিতাকে পবিত্রাত্মা ব্রহ্মচারিণীরূপে আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে। তাঁহাদের মধ্যে একজনও যদি ব্রহ্মজ্ঞা হ'ন তাহা হইলে তাঁহার ব্যক্তিত্বের বিচ্ছুরিত প্রভায় সহস্রসহস্র নারী অনুপ্রাণিত ও সত্যব্রতে দীক্ষিত হইবে এবং ইহাতে দেশ ও সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে।

ত্যাগধর্মে দীক্ষা

সুশিক্ষিতা ও সুচরিত্রা ব্রহ্মচারিণীগণকে শিক্ষাদানের ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে ও নগরে নগরে কেন্দ্র করিয়া তাঁহাদিগকে স্ত্রী-শিক্ষাবিস্তারের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। এইরূপ চরিত্রবতী একনিষ্ঠা প্রচারিকাগণের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়াই দেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রকৃত প্রচার হইবে। ইতিহাস এবং পুরাণ, গৃহকর্ম্ম ও শিল্প, গার্হস্থ্য-জীবনের কর্ত্তব্য এবং চরিত্রগঠনের মূলনীতিসমূহ শিক্ষা দিতে হইবে। সীবনবিদ্যা ও সূচিশিল্প, রন্ধনবিদ্যা, নিত্যনৈমিত্তিক কর্মের নিয়মাবলী এবং সন্তানসন্ততি প্রতিপালন-প্রণালীও শিক্ষা দিতে হইবে। জপ, ধ্যান ও পূজা-

অপরাবিদ্যার শিক্ষা

পদ্ধতি ঐ শিক্ষার অপরিহার্য্য অঙ্গ হইবে। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে সাহস ও শৌর্য্যমূলক তেজস্বিতা অর্জন করিতে হইবে। বর্তমানে আত্মরক্ষার কৌশল শিক্ষারও প্রয়োজন হইয়াছে।

ঝাঁসীর রাণী কত বড় বীরাঙ্গনাই না ছিলেন! এই প্রকারেই আমরা ভারতের জাতীয় প্রয়োজনে নিঃশঙ্কচিত্তা বীরাঙ্গনাদের দেশের কাজে নিয়োগ করিতে পারিব। সেই রমণীগণ তখন সংঘমিত্রা, লীলাবতী, অহল্যাবাই ও মীরাবাইয়ের গৌরবময় ঐতিহ্যধারা অনুসরণ করিবার যোগ্যতা লাভ করিবে, তখন তাহারা বীরপ্রসূ জননীর গৌরবও লাভ করিবে। কারণ, তাহারা পাপলেশশূন্যা এবং নির্ভীকা। যে মহাশক্তি ঈশ্বরের পাদস্পর্শ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে সেই শক্তিতে বলীয়সী হইয়া কালে তাহারা যাহাতে আদর্শ গৃহলক্ষ্মী হইয়া উঠিতে পারে তাহাও দেখিতে হইবে। এইরূপ মায়ের গর্ভে যে সকল সন্তানের জন্ম হইবে তাহারাই নিজেদের ধর্ম্ম-জীবনের বৈশিষ্ট্য আরও প্রগতিশীল করিয়া তুলিবে। যে সংসারের জননীরা সেইরূপ সুশিক্ষিতা ও ধর্ম্মপ্রাণা, সেই সংসারেই মহাপুরুষদিগের জন্ম হয়।

আত্মরক্ষা

নারীজাতির উন্নতি হইলে তাহাদেরই সৎকর্ম্মপ্রভাবে তাহাদের সন্তানসন্ততিগণ দেশের মুখ উজ্জ্বল করিবে। তখনই দেশে সংস্কৃতি, জ্ঞান, শক্তি ও ভক্তির জাগরণ হইবে।

পাশ্চাত্যদেশের জনগণের অবস্থার সহিত আমাদের দেশের জনগণের অবস্থার তুলনা করিয়া স্বামীজি বলিয়াছেন— আমাদের জনসাধারণের অজ্ঞতাই আমাদের জাতীয় মহাপাপ, জনশিক্ষাই আমাদের জাতীয় সমস্যার একমাত্র সমাধান, কেবল সাধারণ শিক্ষাবিস্তার নয়। আধ্যাত্মিক সত্যগুলিকেও তাহাদের অধিগম্য করিয়া তুলিতে হইবে, জীবনের সকল পথকেই আধ্যাত্মিকতার আলোকে আলোকিত করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে আমাদের জাতি বাস করে নগরে নয়, পল্লীতে; বাস করে প্রাসাদে নয়, কুটীরে। পল্লীর প্রত্যেক কুটীরে শিক্ষার আলোক পাঠাইতে হইবে। চাই এজন্য শিক্ষিত লোকদের সহৃদয়তা ও সহানুভূতি। জাতিকে বাঁচাইতে হইলে অশিক্ষিত জনগণকে শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষিত নাগরিকদের আত্মত্যাগ করিতে হইবে।

আট

জনশিক্ষা

ভারতের দীনহীন দরিদ্রের দুরবস্থার কথা ভাবিলে আমার হৃদয় ব্যথিত হয়। প্রতিদিনই তাহাদের অবস্থা হীন হইতে হীনতর হইতেছে। নিষ্ঠুর সমাজের আঘাত তাহারা অনুভব করে, কিন্তু জানে না কোথা হইতে সে আঘাত আসে। তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে যে, তাহারাও মানুষ। মনুষ্যত্ববোধ তাহাদের অসাড় হইয়া আছে। আমার হৃদয় তাহাদের ব্যথায় পরিপূর্ণ। যতদিন পর্যন্ত কোটীকোটী মানব অনাহারে ও অজ্ঞতার অন্ধকারে জীবন যাপন করিবে, ততদিন দেশের প্রত্যেক লোককে আমি বিশ্বাসঘাতক বলিব। কারণ, এজন্যই তাহারা দায়ী। তাহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিনিময়ে শিক্ষিত হইয়া লোকে তাহাদের প্রতি উদাসীন থাকে। জন-সাধারণকে উপেক্ষা করা আমাদের একটা জাতীয় কলঙ্ক এবং ইহাই আমাদের অধোগতির কারণ। ভারতের জনসাধারণ

জাতীয় মহাপাপ

যত দিন না আবার সুশিক্ষা, যথাযোগ্য গ্রাসাচ্ছাদন ও সহানুভূতি ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিতেছে, ততদিন যতই রাজনীতিক আন্দোলন হউক কিছুতেই কিছু হইবে না।

জনশিক্ষাই আমাদের জাতীয় সমস্যার একমাত্র সমাধান

জনসাধারণের মধ্যে যে পরিমাণে শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রসার হয়, সেই পরিমাণেই জাতির উন্নতির পথে অগ্রগতি হয়। ভারতের অধঃপতনের প্রধান কারণ মুষ্টিমেয় কতকগুলি লোক শিক্ষা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে একচেটিয়া করিয়া লইয়াছে। আমাদের যদি পুনরায় উন্নতি করিতে হয়, তাহা হইলে জনগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের দ্বারাই করিতে হইবে। হৃত ব্যক্তিত্বের পুনঃ প্রতিষ্ঠাকল্পে ও তাহাদের শিক্ষাদানকেই নিম্নশ্রেণীর জনগণের একমাত্র সেবা বুঝিতে হইবে। তাহাদের চারিদিকে জগতে কি ঘটিতেছে, তৎপ্রতি তাহাদের দৃষ্টি ফিরাইতে হইবে এবং তখন তাহারা আপন আপন মুক্তির পথ খুঁজিয়া লইবে। প্রত্যেক জাতির মতো প্রত্যেক পুরুষ ও প্রত্যেক নারীকে অবশ্যই নিজের মুক্তি নিজে অর্জন করিতে হইবে। তাহাদিগকে ভাবিবার বিষয় দাও। এই একমাত্র সাহায্যই তাহারা চায় এবং তাহা হইলেই অবশিষ্টগুলি ফলরূপে আপনা হইতেই আসিয়া পড়িবে। আমাদের কাজ হইল রাসায়নিক উপাদানগুলিকে একত্র করিয়া দেওয়া, প্রকৃতির নিয়মে তাহারা দানা বাঁধিবে।

আমাদের পুঁথিপত্রও মুষ্টিমেয় কয়েকটি লোকের অধিকারে রক্ষিত। মঠবিহার ও আশ্রমে লোকচক্ষুর অন্তরালে সেগুলি অবস্থান করিতেছে। এইগুলির মধ্যে যে আধ্যাত্মিক রত্নসমূহ নিহিত আছে, সেগুলির প্রকাশ করাই আমার মতে প্রধান কর্ত্তব্য হওয়া উচিত। যাহারা জ্ঞানকে লুকাইয়া রাখিয়াছে, কেবল তাহাদের নিকট হইতেই উহাকে বাহিরে আনিলে চলিবে না, পরন্তু আরও অধিক দুরধিগম্য ভাণ্ডার হইতেও তাহাকে উদ্ধার করিতে হইবে। অর্থাৎ যে সংস্কৃত ভাষায় ইহা সংরক্ষিত সেই ভাষার বহু শতাব্দীব্যাপী শাব্দিক আবরণ ভেদ করিয়া উহাকে উদ্ধার করিতে হইবে।

আধ্যাত্মিক সত্যগুলিকে তাহাদের অধিগম্য করিয়া তোল

এক কথায় আমি উহাদিগকে সর্বজনাধিগম্য করাইতে চাই। ঐ জ্ঞান হইতে কেহই যেন বঞ্চিত না হয়। আমি এই সকল ভাবধারাকে বাহিরে প্রকাশ করিতে চাই; উহা সাধারণের সম্পত্তি হউক; সংস্কৃত জানুক বা না জানুক ভারতের প্রত্যেকটি লোকের উহা সাধারণ সম্পত্তি হউক।

এই পথে প্রধান অন্তরায় হইল ভাষাগত অসুবিধা। সংস্কৃত ভাষা আমাদের গৌরবময় ভাষা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সমগ্র জাতি যতদিন পর্যন্ত না সংস্কৃতে সুপণ্ডিত হইতেছে ততদিন এই অসুবিধা দূরীভূত হইবে না। তোমাদের যদি এই কথা বলি,

সারাজীবন ধরিয়াই আমি এই ভাষা শিখিতেছি, তথাপি প্রত্যেক নূতন পুস্তকই আমার নিকট অপরিচিত বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে অসুবিধার গুরুত্ব তোমরা উপলব্ধি করিবে। যাহাদের ভাল করিয়া সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিবার সুযোগ কখনও হয় নাই, তাহাদিগের নিকট ইহা কত কঠিন, তাহা অনুমান কর। অতএব সমুচ্চ ভাবগুলিকে অবশ্যই মাতৃভাষায় শিক্ষা দিতে হইবে।

মাতৃভাষার মধ্য দিয়া সত্য প্রচার

জনসাধারণকে মাতৃভাষায় শিক্ষা দাও। ভাবগুলির সহিত তাহাদের পরিচয় সাধন কর, তাহারা বহু সারবান্ তথ্য পাইবে। ইহাই যথেষ্ট নয়, আরও কিছু প্রয়োজন। তাহাদিগকে ভারতীয় সংস্কৃতির সহিত পরিচিত করাও। তাহা না হইলে জনসাধারণের উন্নত অবস্থাও বেশি দিন স্থায়ী হইতে পারে না।

সংস্কৃত শিক্ষা

সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষারও প্রচলন করিতে হইবে। কারণ, সংস্কৃতের শব্দধ্বনিই জাতির মনে মর্য্যাদাবোধ, তেজস্বিতা ও আত্মবিশ্বাস সঞ্চার করে। জনসাধারণের পক্ষে সংস্কৃতভাষা শিক্ষা বন্ধ করিয়া ভগবান বুদ্ধও এক ভুল পথ অনুসরণ করেন। তিনি হাতে হাতে অবিলম্বিত দ্রুতলভ্য ফলের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন। প্রচলিত পালি ভাষায় তিনি ধর্মপুস্তকের অনুবাদ ও প্রচার করিয়াছিলেন। উহা যথাযথই হইয়াছিল। তিনি জনসাধারণের ভাষায় বাণী প্রচার

করিয়াছিলেন বলিয়া জনসাধারণও তাঁহার বাণী উপলব্ধি করিয়াছিল। ইহা দ্রুত ভাববিস্তারের সহায়তা করিয়াছিল এবং দূরদূরান্তরে উহা সহজে পৌঁছিতে পারিয়াছিল। কিন্তু উহাদিগের সহিত সংস্কৃত ভাষারও প্রচার করা উচিত ছিল! উহাতে জ্ঞানের বিস্তার হইয়াছিল, কিন্তু জাতীয় মর্য্যাদা রক্ষিত হয় নাই। সংস্কৃত শিক্ষা না দিলে নূতন এক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইবে। এই সম্প্রদায় সংস্কৃত ভাষার সুযোগ লইয়া শীঘ্রই অপর সকলকে অতিক্রম করিবে। যাহারা সংস্কৃত শিক্ষা করিবে তাহারা নূতন একটা জাতিরই সৃষ্টি করিবে।

আমাদের জাতি বাস করে কুটীরে

স্মরণ রাখিও, আসল জাতি বাস করে পল্লীর কুটীরে। বর্ত্তমানে তোমাদের কর্ত্তব্য দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত গিয়া, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পরিভ্রমণ করিয়া লোককে বুঝাইয়া দেওয়া যে, অলস হইয়া থাকিলে আর চলিবে না। তাহাদিগকে প্রকৃত অবস্থা বুঝাও এবং বল। ভাই সব ওঠ! জাগ! আর কতদিন ঘুমাইয়া থাকিবে? তাহাদিগকে উপদেশ দাও, কি ভাবে নিজ অবস্থার উন্নতি করিতে হয়। প্রাঞ্জল ও সর্ব্বজনপ্রিয় পন্থায় শাস্ত্রের অন্তর্নিহিত সত্যগুলি তাহাদিগকে বুঝাও। তাহাদের বুঝাও যে, ধর্ম্মে ব্রাহ্মণদেরই একচেটিয়া অধিকার নয়। ধর্ম্মে ব্রাহ্মণদিগের মত তাহাদেরও সমান অধিকার। আচণ্ডাল জন-

সাধারণকে এই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত কর। জীবনের অবশ্য প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি ও ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞাতব্যগুলি সহজ সরল ভাষায় তাহাদিগকে শিক্ষা দাও।

জীবনের সকল পথকে আধ্যাত্মিকতায় আলোকিত কর।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া, সহস্র বৎসরের জাত্যভিমানের পীড়নে, জাতিভেদের অনাচারে, দেশী ও বিদেশীয় শাসকগণের অত্যাচারে তাহাদের সকল শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে। শক্তি আহরণের প্রথম স্তরই হইল উপনিষদকে অনুসরণ করা। বিশ্বাস করিতে হইবে, আমিই সেই পরমাত্মা, আমাকে অস্ত্র খণ্ডিত করিতে পারে না; অসি আমাকে বিদ্ধ করিতে পারে না; অগ্নি আমাকে দগ্ধ করিতে পারে না; বায়ু আমাকে শুষ্ক করিতে পারে না। আমি সর্বশক্তিমান, আমি সর্বজ্ঞ। বেদান্তের এই মর্মবাণী অরণ্য ও গুহা হইতে জনসমাজের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ুক। উচ্চ নীচ সকলের মধ্যে, ধনীর প্রাসাদ ও দরিদ্রের পর্ণকুটীরে, উহা সক্রিয় হউক। উকিল, জজ, ব্যারিষ্টার হইতে একজন মৎস্যজীবী ধীবরের জীবনে পর্য্যন্ত এই বাণী ক্রিয়াশীল হউক। প্রত্যেক ছাত্রের জীবনে ইহা প্রভাব বিস্তার করুক। কি পুরুষ কি নারী, কি বালক বালিকা সকলকেই উপনিষদ্ আহ্বান করিতেছে—উপনিষদ্ কাহাকেও উপেক্ষা করে না, সকলকেই পথের সন্ধান দিতেছে। ধীবর যদি চিন্তা করে যে,

সে পরমাত্মার সহিত অভিন্ন তাহা হইলে সে শ্রেষ্ঠতর ধীবর হইবে। ছাত্র যদি চিন্তা করে যে, সে পরমাত্মার সহিত অভিন্ন সে শ্রেষ্ঠতর ছাত্র হইবে।

প্রত্যেক গৃহে শিক্ষার আলোক পাঠাইতেই হইবে

দারিদ্র্যই ভারতের সর্ব্ববিধ দুর্গতির মূল নিদান। প্রতি গ্রামে তুমি অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেও কোন ফল হইবে না। ভারতে দারিদ্র্য এত অধিক যে, দরিদ্র বালকগণ বিদ্যালয়ে আসার পরিবর্তে বরং মাঠে যাইয়া পিতাকে সাহায্য করিবে, নয়ত কোন উপায়ে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করিবে। এখন পর্বত যদি মোহম্মদের কাছে না আসে, মোহম্মদকেই পর্বতের কাছে যাইতে হইবে। দরিদ্র বালকগণ যদি শিক্ষার জন্য না আসে শিক্ষাকেই তাহাদের কাছে যাইতে হইবে।

আমাদের দেশে সহস্র সহস্র একনিষ্ঠ আত্মত্যাগী সন্ন্যাসী আছেন। তাঁহারা গ্রামে গ্রামে যাইয়া ধর্মশিক্ষা দিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কতকগুলিকে যদি লৌকিক ও ব্যবহারিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা যায়, তাহা হইলে তাঁহারা একস্থান হইতে অন্য স্থানে দ্বারে দ্বারে যাইয়া কেবল ধর্ম্ম প্রচার করিবেন না, ব্যবহারিক বিষয়েও শিক্ষা দিবেন। ধরুন, দুইজন সন্ধ্যার দিকে ক্যামেরা, ভূ-গোলক ও মানচিত্র ইত্যাদি লইয়া গ্রামে গেলেন। তাঁহারা সাধারণ লোকদিগকে প্রভূত পরিমাণে

জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূগোল শিক্ষা দিতে পারেন। বিভিন্ন জাতির কাহিনী বর্ণনা করিয়া দরিদ্রগণকে তাঁহারা মুখে মুখে শতগুণে অধিক সংবাদ পরিবেষণ করিতে পারিবেন। সারা জীবন ধরিয়া বই পড়িলে যে জ্ঞান জন্মিবে, এইভাবে সে জ্ঞান আরও অধিক সহজে আয়ত্ত হইবে। আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহাদের জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত করিতে হইবে। এইভাবে তাহাদিগকে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও ইহার সহিত ধর্মের গভীর সত্যগুলিও শিক্ষা দাও। জীবনযুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত থাকিয়া তাহাদের জ্ঞানোন্মেষের সুযোগ হয় নাই। এতদিন তাহারা কলের মত কাজ করিয়াছে এবং চতুর শিক্ষিতসম্প্রদায় তাহাদের শ্রমের সারাংশ অধিকার করিয়াছে। কিন্তু কালের পরিবর্তন হইয়াছে। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা ক্রমশঃ এ বিষয়ে সচেতন হইতেছে এবং সর্ব্বপ্রকার অবিচারের বিরুদ্ধে সম্মিলিত শক্তির প্রয়োগ করিতেছে। উচ্চশ্রেণীর লোকেরা যতই চেষ্টা করুক না কেন, আর তাহাদের দাবাইয়া রাখিতে পারিবে না। নিম্নশ্রেণীর ন্যায্য অধিকারলাভে সাহায্য করিলেই উচ্চ-শ্রেণীরও মঙ্গল হইবে। অতএব, আমি বলি, জনসাধারণের শিক্ষায় শক্তিসামর্থ্য নিয়োজিত কর। তাহাদিগকে একথা বল এবং বুঝাও যে, 'তোমরা আমাদিগের ভাই, আমাদেরই রক্তমাংস তোমাদের দেহে।' তোমাদিগের নিকট হইতে তাহারা

এইরূপ সহানুভূতি পাইলে তাহাদের কর্মশক্তি শতগুণে বর্ধিত হইবে।

মহৎ অনুষ্ঠানের জন্য তিনটী জিনিসের প্রয়োজন। প্রথম হৃদয়ের অনুভূতি। বুদ্ধি বা যুক্তিতে কি আছে? কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াই ইহা থামিয়া যায়। প্রকৃত প্রেরণা আসে অন্তর হইতে। প্রেম অসম্ভবকে সম্ভব করে। অতএব হে আমার ভবিষ্যতের দেশভক্তগণ, হৃদয় দিয়া অনুভব করিতে শিখ। তুমি কি অনুভব কর? তোমরা কি একথা অনুভব করিতে পার যে, দেবতা ও ঋষির কোটি কোটি বংশধরগণ আজ পশুর পর্য্যায়ে নামিয়া আসিয়াছে? তুমি কি অনুভব কর যে, কোটি কোটি লোক অনশনে দিন যাপন করিয়া আসিতেছে? একথা কি চিন্তা কর যে, অজ্ঞতা কালমেঘের মত সমগ্র দেশকে আবৃত করিয়াছে? ইহা কি তোমাকে বিচলিত করে? ইহা কি তোমার চোখের নিদ্রা হরণ করে? ইহা কি তোমার রক্তের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া ধমনীতে প্রবাহিত হইয়া হৃৎস্পন্দনের সহিত তালে তালে স্পন্দিত হইতেছে? তুমি কি ইহা ভাবিয়া প্রায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছ? জাতির আসন্ন ধ্বংসের বেদনাময়ী চিন্তা কি তোমাকে ভাবাবিষ্ট করিয়াছে এবং তুমি তোমার নাম যশ, তোমার স্ত্রীপুত্রপরিবার, তোমার সম্পত্তি,

মহৎ অষ্ঠন্থানের জন্য প্রয়োজন সহৃদয়তা

এমন কি তোমার দৈহিক সত্তা পর্য্যন্ত কি ভুলিয়া আত্মহারা হইতে পারিয়াছ? এই চিন্তাই জাতীয় উন্নতির প্রথম সোপান।

বৃথা অসার বাক্যব্যয়ে তোমার উদ্যম নষ্ট না করিয়া তুমি কোন পথ আবিষ্কার করিয়াছ? উহাদের দুঃখকষ্টে সান্ত্বনা দিবার কোন বাস্তব সমাধান কি খুঁজিয়াছ? তাহাদিগকে জীবন্মৃত অবস্থা হইতে উদ্ধার করিবার কোন চেষ্টা করিয়াছ? ইহাই সব নহে। তোমার কি পর্বতপ্রমাণ বাধা অতিক্রম করিবার মত প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি আছে? সমগ্র জগৎ যদি তরবারি হস্তে তোমার বিপক্ষে দাঁড়ায়, তথাপি তুমি যাহা ভাল মনে করিয়াছ তাহা করিতে সাহসী হইবে কি? তোমার স্ত্রীপুত্র যদি ইহার বিপক্ষে যায়, যদি তোমার অর্থহানি হয়, তোমার নাম পর্য্যন্ত বিলোপ পায়, তোমার সম্পদ বিনষ্ট হয় তাহা হইলেও কি তুমি ঐ কার্য্যে রত থাকিবে? তুমি কি তথাপি ইহার অনুসরণ করিবে ও ধীর পদক্ষেপে নিজ লক্ষ্য পথে যাইবে?

সমাধান

অবিচলিত

ঐকান্তিক

মহারাজ ভর্তৃহরি যেমন বলিয়াছেন, সাধুগণ নিন্দা করুন বা প্রশংসা করুন, ভাগ্যদেবী আসুন বা যথা ইচ্ছা চলিয়া যান, মৃত্যু আজই আসুক বা শত বৎসর পরেই আসুক, তিনিই

প্রকৃত প্রস্তাবে দৃঢ়মনা, যিনি সত্যপথ হইতে এক বিন্দুও বিচলিত হইতে ইচ্ছুক ন'ন।"

তোমাদের কি সেরূপ দৃঢ়তা আছে? যদি তোমাদের এই তিনটি জিনিস থাকে তাহা হইলে তোমরা অসাধ্য সাধন করিতে পারিবে।

উপাসনারূপ কার্য

এস আমরা প্রার্থনা করি, 'হে প্রভু, আমাদিগকে প্রেমের আলোকে চালিত কর।' অন্ধকারের মধ্য হইতে আলোক আসিবে এবং আমাদিগকে আগাইয়া লইয়া যাইতে হস্ত প্রসারিত হইবে। দারিদ্র্য-পিষ্ট, পুরোহিত তন্ত্রের শাসনে পীড়িত কোটী কোটী পতিত ভারতবাসীর জন্য আসুন আমরা প্রতিদিন প্রার্থনা করি। ধনী ও উচ্চ শ্রেণী অপেক্ষা আমি তাহাদিগের মধ্যেই প্রচার করিতে অধিক যত্নবান্।

আমি শাস্ত্রজ্ঞ নহি, দার্শনিক নহি, এমন কি তোমরা যাহাকে সন্ন্যাসী বল, তাহাও নহি। কিন্তু আমি দরিদ্র। আমি দরিদ্রকে ভালবাসি। দারিদ্র্য ও অজ্ঞতায় চিরনিমগ্ন ত্রিংশ কোটী নরনারীর জন্য কষ্টানুভব করে? তাহাকেই আমি মহাত্মা বলি—যিনি দরিদ্রের দুঃখে দুঃখী। কে তাহাদের কথা ভাবে যাহারা শিক্ষার আলোক পায় না, কে তাহাদিগকে সে আলোক দেখাইবে? কে দ্বারে

দ্বারে যাইয়া তাহাদের শিক্ষা দিবে ? এই সকল দরিদ্র জনসাধারণই তোমার দেবতা হউক। তাহাদের জন্য চিন্তা কর, তাহাদের জন্য কাজ কর, অনবরত তাহাদের জন্য প্রার্থনা কর। প্রভু তোমাকে পথ দেখাইবেন।

সমাপ্ত

শিক্ষা—স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত।

পুস্তকখানি স্বামী বিবেকানন্দের ইংরেজী বক্তৃতা, কথোপকথন ও পত্রাবলী হইতে সংকলিত শিক্ষা সম্বন্ধে মর্মস্পর্শী বাণীসমূহের বঙ্গানুবাদ। ইহাতে স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় একজন দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন মৌলিকচিন্তাশীল স্বদেশ-হিতৈষী মানবপ্রেমিক ঋষির শিক্ষা ও উহার পদ্ধতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট অভিমত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মানুষগঠনোপযোগী শিক্ষা, শিক্ষাতত্ত্ব, শিক্ষার একমাত্র পদ্ধতি, শিক্ষক ও ছাত্র, চরিত্রগঠনের শিক্ষা, ধর্মশিক্ষা, নারীগণের শিক্ষা, জনশিক্ষা—এই কয়টি বিষয় পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। স্বামীজী বলিয়াছেন—"মানুষের মধ্যে যে পূর্ণত্ব সুপ্ত রহিয়াছে তাহার বিকাশ-সাধনই শিক্ষা। আমরা সেই শিক্ষা চাই যাহার দ্বারা চরিত্র গঠিত হয়, মনের জোর বাড়ে, বুদ্ধি বিকশিত হয় এবং মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে। বিদেশীয় শাসন হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে স্বদেশীয় সংস্কৃতির সকল শাখা আমরা আয়ত্ত করিতে চাই, এবং তৎসঙ্গে ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্য শিল্পবিজ্ঞানশিক্ষাও আবশ্যক।...ধর্মশিক্ষাও আবশ্যক।...ধর্মই শিক্ষার অন্তরতম মর্মস্থল। লোকসমক্ষে যথার্থ সনাতন ধর্মনীতিসূত্রসমূহ উপস্থাপিত করা আবশ্যক।" স্বাধীন ভারতে নূতনভাবে জাতীয় শিক্ষাপ্রবর্তনের জন্য রাষ্ট্রনায়ক, শাসক, শিক্ষাবিদ্‌, শিক্ষক ও বিদ্যার্থী—সকলেরই শিক্ষা সম্বন্ধে স্বামীজীর এই মৌলিক চিন্তাগুলি গভীরভাবে অনুধ্যান ও অনুসরণ করা উচিত।

পুস্তকখানির মুদ্রণ, কাগজ ও প্রচ্ছদপট সুন্দর হইয়াছে। পুস্তকখানির বহুল প্রচার দ্বারা দেশের যথার্থ কল্যাণ হইবে।

(উদ্বোধন, শ্রাবণ ১৩৫৬ সাল)

বর্ত্তমানে শিক্ষা-সংস্কারের প্রচেষ্টা হইতেছে। স্বামীজীর শিক্ষা সম্বন্ধীয় উক্তিগুলি সকলেরই বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য। তিনি যে আদর্শের আভাস মাত্র দিয়েছেন তাহার কিঞ্চিন্মাত্র যদি আমরা কার্য্যে পরিণত করি, তবে দেশ সুশিক্ষিত হইবে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই পুস্তক প্রকাশ করিয়া প্রকাশক মহাশয় আমাদের ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন।

[বাংলার শিক্ষক, আষাঢ় ১৩৫৬ সাল]

Siksha—By Swami Vivekananda

Swami Vivekananda heralded the advent of the modern age. Netaji said that words were not adequate to express his indebtedness to the great "Sannyasin". Sri Aurobindo asserts that Swamiji's noble influence has been shaping the destiny of India. Mahatmaji said: "Surely Swami Vivekananda's writings need no introduction from any body. They make their own irresistible appeal". The volume under review containing Swamiji's views on Education deserve to be widely read.

[Amrita Bazar Patrika 10. 7- 49.]

শিক্ষা—স্বামী বিবেকানন্দ—

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী আজ লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীকে অনুপ্রাণিত করিয়া থাকে। স্বাধীনতা লাভের পর জাতীয় শিক্ষাপ্রবর্তনের সমস্যারই সর্বাগ্রে সমাধান প্রয়োজন। এই সময়ে স্বামীজীর বাণী নিশ্চয়ই সকলকে উদ্বুদ্ধ করিবে।

[যুগান্তর ১০।৭।৪৯]

—Books for all Times—

Lecture from—

Colombo to Almora—Swami Vivekananda

Our Education—Swami Nirvedananda

Civics and National Ideals—Nivedita

Life Divine—Vol I, II Sri Aurobindo

Mother— „

Hinduism Outside India

Life beyond Death—Abhedananda

দেশ বিদেশের মহামানব—

সচিত্র যৌগিক ব্যায়াম—

চৈনিক ঋষি লাউৎজে—

বিনা চশমায় ক্ষীণ দৃষ্টি ও তাহার প্রতিকার—

ভারতীয় সংস্কৃতি—অভেদানন্দ

তীর্থ রেণু—প্রজ্ঞানানন্দ

শ্রীদুর্গা—

রাগ ও রূপ—প্রজ্ঞানানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্তরঙ্গ প্রসঙ্গ

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় সঙ্গীত ও সঙ্গীতে সমাধি

স্বামীজীর স্বপ্ন ও নেতাজী

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ প্রণীত কয়েকটি পুস্তক

১।	স্বামীজীর দুই সন্ন্যাসীশিষ্য স্বামী শুদ্ধানন্দ ও প্রকাশানন্দ।	১৲
২।	নবযুগের মহাপুরুষ ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ষোলটী সন্ন্যাসী শিষ্য ও আটটী গৃহী শিষ্য এবং স্বামী বিবেকানন্দের ছয়টি সন্ন্যাসী শিষ্যের জীবনচরিত।	৬৲
৩।	মহামায়া শ্রীশ্রীচণ্ডীর আখ্যায়িকা ও তত্ত্ব	১॥০
৪।	সাধিকামালা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চারিটী শিষ্যা গৌরী মা, গোপাল মা, যোগীন মা ও গোপালের মা এবং স্বামী বিবেকানন্দের ইংরাজ শিষ্যা ভগ্নী নিবেদিতা ও ফরাসী শিষ্যা এমা কাল্‌ভে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘজননী সারদাদেবী প্রভৃতি ষোলটী সাধিকার জীবনালেখ্য।	২৲
৫।	স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ	৪৲
৬।	স্বামী বিজ্ঞানানন্দ	৩৲
৭।	শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা (৪র্থ সংস্করণ)	২৲
৮।	শ্রীশ্রীচণ্ডী (৪র্থ সংস্করণ)	২৲
৯।	আমার ভ্রমণ (সচিত্র)	৩॥০

প্রাপ্তিস্থান

রায় চৌধুরী এণ্ড কোং
কলিকাতা২৬